স্বর্ণমণি পারিতোষিক প্রবন্ধ।

১ম। মাতৃ-ভক্তি এবং মাতৃ উপাসনাতেই সন্তানের মুক্তি।

২য়। ভাতের ফেন গালা অকর্ত্তব্য, তর্জ্জন্য এদেশ-বাসীগণ হীনবল ও নির্দ্ধন হইতেছে।

শ্রীপূর্ণ চন্দ্র মিত্র মুস্তৌফী
এবং
শ্রীঅতুল চন্দ্র মিত্র মুস্তৌফী

কর্ত্তৃক
প্রকাশিত
শ্রীপুর
১৩০১ সাল।

মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

এই "স্বর্ণমণি পারিতোষিক প্রবন্ধ" গ্রন্থ খানি ১৮৪৭ সালের ২০ আইন অনুসারে রেজেষ্টরী করা হইল।

শ্রীপূর্ণ চন্দ্র মিত্র মুস্তৌফী।
শ্রীঅতুল চন্দ্র মিত্র মুস্তৌফী।

... যন্ত্রে,
... কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মাতৃভক্তি এবং মাতৃ উপাসনাতেই সন্তানের মুক্তি।

হাবড়া জেলার অন্তর্গত বালি গ্রাম নিবাসী
শ্রীযুক্ত বাবু সাতকড়ি গোস্বামী প্রণীত।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ দুই খানি স্বর্গারূঢ়া জননী দেবীর কোমল করপল্লবে জগদম্বার স্বরূপ সমর্পিত হইল।

মাগো!

তোমাকে কি দিয়া তৃপ্তিলাভ করিব বলিতে পারিনা। তুমি আমাদিগকে গর্ব্ভে ধারণ করিয়াছ, নিদারুণ প্রসবযন্ত্রণা সহ্য করিয়াছ, কত ক্লেশ স্বীকার করিয়া লালন পালন করিয়াছ, তুমি আমাদের আহারদাত্রী ও রক্ষাকর্ত্রী, যত দিন জীবিত ছিলে, কায়মনোবাক্যে আমাদের উপকার করিয়াছ। যদিও তুমি এক্ষণে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া দ্যুলোকে অবস্থান করিতেছ, তথাপি আমাদের সুখশান্তির জন্য এমনি মধুময় "মা" নাম রাখিয়া গিয়াছ, যে নিদারুণ ক্লেশের সময়েও সেই অমৃতধারাবাহী নাম উচ্চারণ করিয়া অদ্যাপি দুঃখরৌদ্রেও সুখের ছায়া পাতিত করি এবং খিদ্যমান অবসন্ন দেহেও বল সঞ্চারিত করি। মাগো! সত্য সত্যই তুমি সেই শক্তিরূপিণী প্রকৃতি। আমরা আজীবন

তোমার নিকট ঋণী ; আমাদের কেশমূল হইতে নখাগ্র পর্য্যন্ত শরীরের সমস্ত উপাদান তোমার পরমাণুতেই নির্ম্মিত। তোমার নিকট আমাদের যে ঋণ, কিছুতেই তাহার নিষ্ক্রয় নাই। তোমাকে আর কি উপহার দিব ? অসীম কৃতজ্ঞতার যৎসামান্য চিহ্নস্বরূপ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ দুই খানি তোমাকে উপহার দিলাম, ইহাদিগকে স্নেহের চক্ষে দেখিলেই চরিতার্থ হইব। পুত্রপ্রদত্ত উপহার যতই সামান্য হউক না, উহা মাতার নিকট বহুমূল্য ও বহু আদরের সামগ্রী, এই সাহসেই তোমাকে এই অকিঞ্চিৎকর উপহার প্রদানে সাহসী হইলাম। বিশেষতঃ তুমি এক্ষণে স্বর্গরাজ্যে বিরাজিত আছ ; অকিঞ্চিৎকর দ্রব্যও সরলান্তঃকরণে ভক্তিভাবে প্রদান করিলে স্বর্গবাসীগণ সাদরে গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হন। অকপট হৃদয়ে ভক্তিযোগ সহকারে সামান্য ফল, পুষ্প ও চন্দন প্রদান করিলেও যখন ত্রিদিববাসীগণ পরিতৃপ্ত হন, তখন সেই স্বর্গারূঢ়া পরম স্নেহময়ী জননী দেবী যে পরম বৎসলপুত্রপ্রদত্ত সভক্তিক সামান্য উপহার অগ্রাহ্য করিয়া ফেলিয়া দিবেন, ইহা কখন সম্ভবপর নহে। মাগো ! এক্ষণে বিদায় গ্রহণ করি, আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার চরণে চিরদিন আমাদের অচলা ভক্তি থাকে। ইতি—

তোমার চিরানুগত সেবক,

শ্রীপুর
১৩০১। ৩১ শে
জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীপূর্ণ চন্দ্র মিত্র মুস্তৌফী।
শ্রীঅতুল চন্দ্র মিত্র মুস্তৌফী।

মুখবন্ধ।

হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীপুর নিবাসী সম্মানাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণ চন্দ্র মুস্তৌফী ও শ্রীযুক্ত বাবু অতুল চন্দ্র মুস্তৌফী সহোদরদ্বয় মাতৃভক্তিপ্রণোদিত হইয়া স্বর্গারূঢ়া স্বর্ণমণি নাম্নী মাতা ঠাকুরাণীর নামে তিনটী পারিতোষিক প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে সংবাদ পত্রাদিতে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত করান। এই গুলির নাম স্বর্ণমণি পারিতোষিক। নিম্নলিখিত বিষয় গুলির রচনা যাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, তিনিই নির্দ্দিষ্ট পারিতোষিক লাভ করিবেন, এইরূপ নির্দ্ধারিত হয়:—

১ম। "মাতৃভক্তি এবং মাতৃ উপাসনাতেই সন্তানের মুক্তি।"

২য়। "মাতৃ-দুগ্ধ অভাবে গো দুগ্ধে জীবনরক্ষা, গো দুগ্ধের উপকারিতা এবং গোহত্যার অন্যায্যতা, এবং ভারতবর্ষে গোমাংস ভক্ষণের অপকারিতা।" (ইংরাজি বা উর্দ্দু ভাষায়)

৩য়। "ভাতের ফেন গালা অকর্ত্তব্য। তজ্জন্য এদেশ বাসীগণ হীনবল ও নির্দ্ধন হইতেছে।"

বিজ্ঞাপনে সুস্পষ্ট লিখিত ছিল, ১৮৯৩ খৃঃ অব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখের পূর্ব্বে ঐ সকল বিষয়ের রচনা তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করা আবশ্যক। ১৮৯২ খৃঃ অব্দের নভেম্বর মাসে এক খানি সংবাদ পত্রে ঐ বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া আমার হৃদয়ে প্রথম রচনাটী লিখিবার বাসনা জন্মে; কিন্তু পরে ভাবিয়া দেখিলাম, কত কত কৃতবিদ্য ব্যক্তি, কত কত জ্ঞানালোকসম্পন্নমহাত্মা, কত শত খ্যাতনামা লেখক এ বিষয়ে লেখনী চালনা করিবেন, অতএব আমার ন্যায় মন্দবুদ্ধি ব্যক্তির এরূপ গুরুতর বিষয়ে

হস্তার্পণ করা ধৃষ্টতা প্রকাশ মাত্র। কালিদাসরচিত শ্লোকটী স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল :—

"ক্ব সূর্য্যপ্রভবোবংশঃ ক্ব চাল্প বিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষুর্ দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্॥"

মনে মনে চিন্তা করিলাম, কচ্ছপের খেচর পক্ষীর মত আকাশ মার্গে পরিভ্রমণচেষ্টার ন্যায়, বামনের চন্দ্র ধারণে হস্তপ্রসারণের ন্যায় আমারও "মাতৃভক্তি এবং মাতৃউপাসনাতেই সন্তানের মুক্তি" এতদ্বিষক প্রবন্ধ লিখিবার অভিলাষ নিতান্ত উপহাসজনক সন্দেহ নাই। পুনর্ব্বার কালিদাসরচিত আর একটী শ্লোক স্মরণ করিলাম :—

"মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥"

মনে মনে এইরূপ নানা চিন্তা উদিত হওয়াতে আমি নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারে আমার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলাম, হৃদয়ের অভিলাষ হৃদয়েই বিলীন হইয়া গেল। নূতন বৎসরের সমাগমে মনোমধ্যে অভিনব আশার সঞ্চার হইল। ১৮৯৩ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসের অন্ত্য ভাগে আমার কনিষ্ঠ সহোদর আয়ুষ্মান্ মনোমোহন গোস্বামী ভ্রাতার নির্ব্বন্ধাতিশয়পূর্ণ অনুরোধসমীর সংযোগে আমার, নির্ব্বাণপ্রায় উৎসাহবহ্নি পুনর্ব্বার সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিলাম, যদি পরিশ্রম সফল না হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? পারিতোষিক না পাই, লোকের উপহাসাস্পদই বা হই, তাহাতেই বা আমার দুঃখ কি? আমি ত আর সাহিত্যতরুর উচ্চতর বা উচ্চতম শাখায় আরূঢ় নই, যে পতনের ভয় করিব? উন্নত বৃক্ষেরই পতনের ভয় আছে, সামান্য তৃণের পতনের

ভয় কোথায়? রচনা লিখিয়া পারিতোষিক লাভ করিতে না পারিলেও অন্য দিকে লাভবান্ হইব, সংশয় নাই; ইহাতে রচনা লিখিবার অভ্যাস জন্মিবে, অন্ততঃ যিনি আমাকে গর্ভে স্থান দান করিয়াছেন, যিনি অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া আমার লালন পালন করিয়াছেন, যিনি নিঃস্বার্থ বাৎসল্য সুধার অনন্ত উৎস, যাঁহার নিকট আমি আজীবন ঋণী, সেই সাক্ষাৎ ঈশ্বরী জননী দেবীর অনন্তগুণকীর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহার স্নেহময়ী মূর্ত্তি মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া মানসিক শান্তি লাভ করিব।

মনোমধ্যে এইরূপ নানা আন্দোলন করিয়া আমি অবশেষে লিখিতে প্রবৃত্ত হই। নির্দ্দিষ্ট সময়ের তখন অতি অল্পই অবশিষ্ট ছিল, আমার জ্ঞান ও বুদ্ধিও নিতান্ত অল্প। অল্প সময়, অল্প জ্ঞান ও অল্পবুদ্ধিরূপ অল্প মূলধন লইয়া যতদূর সম্ভব ততদূর লিখিয়া নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বেই রচনা পাঠাইয়া দিলাম। কিন্তু তখন আমার মনে রচনা পারিতোষিকের যোগ্য বলিয়া নির্ব্বাচিত হইবার কোন আশাই ছিল না। বাস্তবিক মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তির এরূপ গুরুতর বিষয়ে রচনা লিখিয়া সফল হওয়া আকাশ কুসুমের ন্যায় নিতান্ত অলীক বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কিন্তু যাঁহার কটাক্ষে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়, যিনি নিমেষ মধ্যে দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপশালী বলদৃপ্ত নরপতিকে পর্ণকুটীরবাসী চীরবসনধারী সামান্য কৃষকরূপে পরিণত করাইতে পারেন, আবার ইচ্ছামাত্রে শাকান্নভোজী সামান্য কৃষককেও সাগরাম্বরা ধরিত্রীর অদ্বিতীয় অধীশ্বর করাইতে পারেন, যিনি মূককে বাগ্মীবর করিতে এবং পঙ্গুকেও ভূধর লঙ্ঘন করাইতে সক্ষম, সেই ইচ্ছাময় সর্ব্বশক্তি-মান্ জগৎস্বামীর অসাধ্য কি? মাদৃশ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি যে উপস্থিত

বিষয়ে সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহা কেবল সেই দয়াময়েরই ইচ্ছা, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রবন্ধটী তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে :—প্রথম মাতৃস্নেহ, দ্বিতীয় মাতৃভক্তি এবং তৃতীয় মাতৃভক্তি হইতে সন্তানের মুক্তি। এরূপ বিভাগ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, মাতা সন্তানের প্রতি কিরূপ স্নেহ করিয়া থাকেন, সন্তানের তাহা হৃদয়ঙ্গম হইলেই তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হইবেই হইবে। কি ঈশ্বর, কি দেবতা, কি গুরুজন, ইহাঁরা সকলে উপকারক বলিয়াই আমাদের ভক্তিভাজন। মর্ত্ত্যলোকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মাতার ন্যায় আর কেহই আমাদের উপকার করিতে পারেন না, এইটী সুন্দররূপ বুঝিতে পারিলেই সন্তান জননীর প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইবেন এবং এই ভক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেই মুক্তিলাভ হইবে। ভক্তকুলতিলক রামপ্রসাদ বলিয়া গিয়াছেন "সকলের সার ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।" বাস্তবিক ভক্তির সমান আর কিছুই নাই। প্রকৃত ভক্ত সদাই আনন্দে কাল যাপন করেন। অভাব, ব্যাধি, মরণ প্রভৃতি সাংসারিক জ্বালা তাঁহাকে কিছু মাত্র ক্লিষ্ট করিতে পারে না, তিনি নিরন্তর ভক্তিসুধা পান করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন। এই নিমিত্তই বৈষ্ণবধর্ম্মে মুক্তি অপেক্ষা ভক্তিরই অধিকতর আদর দেখা যায়। প্রকৃত ভক্ত বৈষ্ণবগণ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁহারা কেবল ভক্তিসুধাপানের জন্যই লালায়িত।

শাস্ত্র সমূহে ৫ প্রকার মুক্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়া থাকে ; সাযুজ্য, সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি ও নির্ব্বাণ। মাতৃভক্তি হইতে সন্তানের কোন্ রূপ মুক্তি লাভ হইবে, উপস্থিত প্রবন্ধে

তাহার কোন বিচার করা যায় নাই। ইহাতে কেবল মুক্তির সাধারণ অর্থই গৃহীত হইয়াছে।

উপস্থিত প্রবন্ধে মাতৃভক্তির গৌরব বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া কেহ যেন এরূপ না বুঝেন যে, পিতৃভক্তি সন্তানের কর্ত্তব্য নহে। মাতৃভক্তি ও পিতৃভক্তি সন্তানের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সন্তানের নিকট পিতা মাতা তুল্য মূল্য। পিতা পুরুষ, মাতা প্রকৃতি, পিতা শিব, মাতা শক্তি, পিতা বীজ, মাতা পৃথ্বী। অতএব মাতৃভক্ত সন্তান যে পিতৃভক্ত হইবেন, তাহাতে আর সংশয় নাই।

উপসংহার কালে পারিতোষিক প্রদাতা শ্রীপুর নিবাসী মুস্তৌফী ভ্রাতৃদ্বয়ের উদারতার বিষয় না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। তাঁহাদের আচরণ এদেশ নিবাসী গণের আদর্শ স্থল। মাতাঠাকুরাণীর নামে এইরূপে পারিতোষিক প্রদান করিবার সঙ্কল্প করিয়া তাঁহারা এককালে তিনটী সুমহৎকার্য্য সাধন করিলেন। তাঁহারা স্বর্গারূঢ়া জননীর নাম দেশ মধ্যে চিরস্মরণীয় করিলেন, মাতৃভক্তির জ্বলন্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া লোকের ভক্তিভাজন হইলেন, আবার পাশ্চাত্য সভ্যতারশ্মির খরতর প্রভাবে এদেশবাসীগণের চিত্তক্ষেত্রস্থিত শুষ্কপ্রায় পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তি রূপ সুকোমল বল্লীর মূলে জীবন সেচন করিয়া দিলেন !!! যে সমস্ত সন্নীতি অন্তর্নিহিত থাকাতে হিন্দুধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্মের শার্ষ স্থানীয়, পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তি তাহাদের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। অধুনা আমরা যে পরিমাণে বৈদেশিক আচার ব্যবহারের অনুকরণপ্রিয় হইয়া উঠিতেছি, সেই পরিমাণে আমাদের ধর্ম্মবন্ধনেরও শৈথিল্য ঘটিতেছে, সুতরাং আমাদের পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তি পরিহীয়মান হইয়া

আসিবে বিচিত্র কি? এই ঘোরতর দুঃসময়ে, এই প্রবন্ধপাঠে যদি এক জনেরও চিত্ত পরিবর্ত্তিত হয়, যদি এক জনও পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তির গৌরব সম্যক অনুভব করিয়া পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করেন, তবে আমার পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব এবং মুস্তৌফী ভ্রাতৃদ্বয়েরও উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন মুস্তৌফী কুলপ্রদীপ ভ্রাতৃদ্বয় দীর্ঘজীবী ও নিরাপৎ হন এবং নিরন্তর দেশহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া দুর্লভ মানব জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করেন।

জগতের কোন বস্তুই সম্পূর্ণ নির্দোষ নহে, উৎকৃষ্ট মনোহর বস্তুতেও দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে, জগতের নিয়মই এইরূপ। যখন মনোহর পূর্ণচন্দ্রেও কলঙ্ক দেখা যায়, যখন মনোজ্ঞ সুকোমল কমল কলিকাও কণ্টকানুবিদ্ধ, তখন যে এই সামান্য প্রবন্ধখানি দোষস্পর্শশূন্য হইবে, এরূপ আশা করা যায় না, প্রত্যুত ইহাতে দোষের ভাগ অধিকতর বলিয়াই প্রতীত হইবে, সন্দেহ নাই। আশা করি উদারমতি বিপশ্চিদ্গণ ইহার দোষ লক্ষ্য না করিয়া কেবল গুণভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক ইহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিবেন।

বালি ১৮৯৪। ২০শে জানুয়ারি।	বিনয়াবনত লেখক শ্রীসাতকড়ি গোস্বামী।

মাতৃভক্তি এবং মাতৃ উপাসনাতেই সন্তানের মুক্তি।

মাতৃ স্নেহ।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই মহা বাক্যটী দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। এই মহা বাক্যটী কোথা হইতে বাহির হইল? আদি কবি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণে উহা লিখিত আছে:—"ইয়ং স্বর্ণপুরী লঙ্কা মিত্রাস্মভ্যং ন রোচতে, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" রঘুবংশাবতংস রামচন্দ্র বিভীষণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন, মিত্র! এই স্বর্ণপুরী লঙ্কাও আমাদের প্রীতি সম্পাদন করিতে পারিতেছে না, যেহেতু জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও মহত্তর। মহামতি রামচন্দ্র জননী ও জন্মভূমি হইতে বিযুক্ত ছিলেন বলিয়া স্বর্ণময় লঙ্কাতেও কি নিমিত্ত সুখানুভব করিতে পারিলেন না? কেনই বা তিনি জননীকে "স্বর্গাদপি গরীয়সী" বলিলেন?

বাস্তবিক জননী "স্বর্গাদপি গরীয়সী" ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত অধিক আয়াসের আবশ্যকতা নাই। অনুধ্যানশীল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির নিকট ইহা একটি স্বতঃসিদ্ধ যাথার্থ্য। যখন অপরিসীম অচিন্ত্য ত্রিসংসারমধ্যে আমাদের অস্তিত্ব ছিলনা, যখন রবিকরোজ্জ্বল, সুস্নিগ্ধ মারুত সেবিত পৃথ্বীতলে আমাদের সূচ্যগ্র প্রমাণ স্থান ছিলনা, তখন জননীই আমাদিগকে গর্ভে স্থানদান

করিয়াছিলেন। আমরা তথায় দশমাস কাল অতিবাহন করিয়াছিলাম। বাতাতপ সহ্য করিতে হয় নাই, নিদাঘের প্রচণ্ড মার্তণ্ডতাপে স্বেদজল বিগলিত হয় নাই, প্রচণ্ড শীতে কম্পান্বিত কলেবর হইতে হয় নাই, জীবিকা উপার্জ্জনের কঠোর পরিশ্রম দেহ অবসন্ন করিতে পারে নাই, অথচ আমরা জননী দেবীর সুকোমল কবোষ্ণ গর্ভশয্যায় শায়িত থাকিয়া দিন দিন উপচিতকায় হইতেছিলাম। তখন জননীর ও আমাদের দেহ ও প্রাণ একই ছিল বলিতে হইবে। তাঁহার আহারেই আমাদের আহার, তাঁহার সুখে সুখ এবং দুঃখে দুঃখ হইত, তাঁহার পুষ্টিতে আমাদের পুষ্টি এবং তাঁহার মনোবৃত্তি অনুসারেই আমাদের মনোবৃত্তি পরিচালিত হইত। গর্ভাবস্থায় প্রসূতি পীড়িত ও ক্ষীণবল হইলে, প্রসূত সন্তান যে দুর্ব্বল হয়, তাহা কাহার অবিদিত আছে? গর্ভাবস্থায় প্রসূতি অধিক শোক অথবা ভয় পাইলে, কিম্বা কোনও কারণে তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিলে, গর্ভস্থ শিশুর অনিষ্ট হয় অথবা কুৎসিত বিকলাঙ্গ কিম্বা নির্ব্বোধ পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন। এই নিমিত্তই সসত্ত্বাবস্থায় যাহাতে স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল থাকে, কোনরূপ পীড়া না হয় এবং ভয় ও চিত্তচাঞ্চল্যের অল্পমাত্র কারণও উপস্থিত হইতে না পারে, সকলেই সেজন্য বিশেষ চেষ্টা পাইয়া থাকেন। ফলতঃ গর্ভাবস্থায় জননী ও শিশুর দেহ ও আত্মা অভিন্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আমরা ত জননী-জঠরে দশ মাস কাল এইরূপে যাপন করি, কিন্তু তখন প্রসূতির কিরূপ অবস্থা? আহা! তাঁহার তৎকালীন

দুঃসহ ক্লেশের কথা স্মরণ করিলে কোন্ নরাধমের অন্তঃকরণে ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত এবং কোন্ পাষণ্ডের চিত্তক্ষেত্র কৃতজ্ঞতারসে পরিপ্লুত না হয়? ছর্দ্দি, বিজাতীয় অরুচি এবং অভূতপূর্ব্ব আলস্য যুগপৎ আসিয়া দেহ অধিকার করিয়া বসে। কোন কার্য্যেই উৎসাহ থাকে না, রসনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর সুস্বাদ খাদ্য দ্রব্যেও নিতান্ত অনাস্থা জন্মে। খাদ্য দ্রব্য কথঞ্চিৎ উদরস্থ হইলেও তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া যায়। ফলতঃ দিন যামিনী দোহদ ব্যথা জনিত অনির্ব্বচনীয় ক্লেশ পরম্পরা সহ্য করিয়া তাঁহার বদনমণ্ডল প্রভাত-কালীন শশধরের ন্যায় নিতান্ত নিষ্প্রভ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া পড়ে। কিন্তু কেবল পুত্রের মুখকমল নিরীক্ষণকরণাশার বিমোহন কুহক প্রভাবেই তিনি এতাদৃশ দুর্ব্বিষহ ক্লেশভোগে কথঞ্চিৎ সমর্থা হন। কাল সহকারে দারুণ দোহদ ব্যথা অতিক্রম করিয়া নবপল্লব-বিমণ্ডিত বসন্তকালীন লতার ন্যায় তিনি পুনরায় শারীরিক উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকেন বটে, কিন্তু নিদারুণ প্রসব যন্ত্রণা স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত করাইতে থাকে।

বাস্তবিক প্রসব বেদনা কি ভয়ানক ব্যাপার!!! অন্য কোনরূপ যন্ত্রণাই ইহার সমকক্ষ নহে। কঠোর প্রসব যন্ত্রণা ভোগ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে সন্তান প্রসব করিতে পারা নারী জাতির পুনর্জ্জন্ম সন্দেহ নাই। উহাতে কত কষ্ট, কত বিপদ্, তাহা প্রসূতিই জানেন আর সেই সর্ব্বান্তর্যামী বিধাতাই বলিতে পারেন। বহুকাল হইতে আমাদের দেশে সসত্ত্বা স্ত্রীর সাধভক্ষণের প্রথা প্রচলিত আছে। সাধভক্ষণের দিন সকলেই সাধ্যমত উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও অলঙ্কারে গর্ব্ভিণীকে সুসজ্জিত করেন এবং সমারোহের সহিত নানা উপাদেয়

খাদ্যদ্রব্য তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে দিয়া থাকেন। অনেকে অনুমান করেন, প্রসূতির মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিলে গর্ত্তস্থ বালকের মঙ্গল হইবে, এই অভিপ্রায়েই প্রসূতির চিত্তবিনোদনার্থ এদেশে সাধ-ভক্ষণ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু প্রসবকালীন অসামান্য যন্ত্রণা ও বিপজ্জাল অতিক্রমপূর্ব্বক প্রসূতি পুনর্জ্জীবন লাভ করিতে পারিবেন কিনা, লোকে এই সন্দেহ পরবশ হইয়া চিরদিনের মত তাঁহার ঐহিক ভোগাভিলাষ পরিপূরণ করিবার জন্য সাধ-ভক্ষণ প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন, এরূপ অনুমান করাও অযৌক্তিক নহে। যাহাহউক প্রসববেদনা যে অতি লোমহর্ষণ ভয়ানক ব্যাপার তাহা কে অস্বীকার করিবে? সংস্কৃত ভাষায় "সর্ব্বংসহা" শব্দে পৃথিবীকে বুঝায়। কিন্তু যে জননী প্রসব যন্ত্রণার নিদারুণ ক্লেশ সহ্য করিতে পারেন এবং গভীর ধীরতা সহকারে সন্তানের নানা উপদ্রব সহিয়া তাহাকে পালন করেন, তিনিও "সর্ব্বংসহা" এই নামের প্রতিপাদ্য না হইবেন কেন?

প্রসবকাল পর্য্যন্ত জননীর অবস্থা একরূপ বর্ণিত হইল। কিন্তু যখন তিনি সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বরের সুপ্রতিষ্ঠিত কৌশলে নির্ব্বিঘ্নে সন্তান প্রসব করিলেন, তখন তাঁহার ভাব আর একরূপ। তখন তিনি আর সামান্যা মানবী নহেন, প্রত্যক্ষ দেবী মূর্ত্তি। তখন তাঁহার আর সেই সুখাভিলাষ নাই, সেই স্বার্থপরতা নাই, তখন তিনি সন্তানের হিতসাধন ব্রতে অনুব্রতা। তাঁহার শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে অপত্যস্নেহস্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত। তাঁহার নিজের অস্তিত্ব জ্ঞান নাই, পৃথিবীস্থ কোন সামগ্রীর প্রতি লক্ষ্য নাই, একমাত্র সন্তানই এক্ষণে তাঁহার হৃদয়াকাশের

ধ্রুবতারা। অগাধ জলধিগর্ত্তস্থিত বাড়বানলের ন্যায়, পুণ্য তোয়া ফল্‌গু নদীর অন্তঃ প্রবাহের ন্যায় যে অনুপম স্নেহরাশি এতদিন তাঁহার হৃদয় কন্দরে অন্তর্নিহিত ছিল, এক্ষণে তাহার পূর্ণ বিকাশ হইল। বিশ্বনিয়ন্তা তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে যে স্নেহের বীজ বপন করিয়াছিলেন, গর্ত্তসঞ্চার সময় হইতে এতদিন যাহা ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হইতেছিল, এক্ষণে সেই স্নেহাঙ্কুর প্রবলরূপে পরিবর্দ্ধিত ও পল্লবিত হইয়া সন্তানকে নিরন্তর মধুময় ফলদানে প্রবৃত্ত হইল।

আহা! মাতৃস্নেহের কি অলোকসামান্য মধুময় ভাব! উহার কি বিচিত্র শক্তি!! বিধাতার কি আশ্চর্য্য কৌশল!!! মাতার অন্তঃকরণে দিব্য স্নেহ প্রদান করিয়া জগদীশ্বর সৃষ্টি রক্ষার কি অসামান্য কৌশলই প্রদর্শন করিয়াছেন!!!! যদি পরম পিতা পরমেশ্বর জননীর সুকোমল অন্তঃকরণ পরম পবিত্র অপত্যস্নেহের উৎস স্বরূপ করিয়া সৃষ্টি না করিতেন, তবে কোন্ কালে সৃষ্টি বিলুপ্ত হইয়া যাইত। জীবসঙ্ঘ শব্দপূরিত সৌধমালা পরি-শোভিত মহানগর জন প্রাণিহীন মরুভূমি সদৃশ ভীষণ ভাব ধারণ করিত। যখন আমরা নিতান্ত শিশু ও একান্ত নিরাশ্রয় ছিলাম, সকল বিষয়েই পর প্রত্যাশী থাকিয়া অন্যের মুখাপেক্ষা করিতাম, ক্রন্দন ব্যতীত কোন বলই ছিল না, তখন ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপা জননী তাদৃশ স্নেহপ্রবণহৃদয়া না হইলে আমরা কি কখন জীবন ধারণে সমর্থ হইতাম? ফলতঃ মাতার স্নেহের নিকট সকল স্নেহই পরাভব প্রাপ্ত হয়। পরম পূজ্যপাদ জন্মদাতা জনক মহাশয় অত্যন্ত স্নেহময় বটেন, কিন্তু মাতার স্নেহের নিকট

তাঁহার স্নেহও অপেক্ষাকৃত ন্যূন। পিতা মহাশয় জীবিকা উপার্জ্জনে ও অন্যান্য কার্য্যে অধিকাংশ সময় ক্ষেপ করেন, সন্তানগণের সহবাসে তিনি অধিক সময় দিতে পারেন না, সন্তানগণকে তিনি গর্ভে ধারণ করেন না, প্রসবের নিদারুণ যন্ত্রণাও তাঁহাকে সহ্য করিতে হয় না; জগদীশ্বর স্ত্রীলোকের ন্যায় তাঁহার অন্তঃকরণে সহিষ্ণুতা এবং ধৈর্য্য গুণ বিতরণেও অপেক্ষাকৃত সংযতহস্ত; সুতরাং তিনি যে সন্তানদিগের প্রতি মাতৃদেবী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্পস্নেহবান্ হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বঙ্গকবিকুলতিলক ভারত চন্দ্র যথার্থই লিখিয়া গিয়াছেন :—

"জনক হইতে স্নেহ জননীর বাড়া
মার কাছে পুত্র যায় বাপে দিলে তাড়া॥"

পশুপক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও পিতার স্নেহাপেক্ষা মাতার স্নেহের উৎকর্ষ উপলব্ধ হয়। ইতর প্রাণীগণের স্ত্রীজাতি সন্তান প্রসবের পর তাহার রক্ষার্থ উগ্রভাব ধারণ করে এবং পরম যত্নে সন্তানের লালন পালন করে, কিন্তু পুরুষ জাতির সেরূপ ভাব লক্ষিত হয় না। সর্প, বিড়াল প্রভৃতির পুরুষ জাতি সন্তান গণের প্রতিপালন করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত উহাদের প্রাণবধ করিয়া ভক্ষণ করে।

যখন মাতার স্নেহের নিকট পিতার স্নেহও অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ, তখন অপর লোকের স্নেহ যে মাতার স্নেহের স্থান পরিপূরণে একান্ত অসমর্থ ইহাতে আর সন্দেহ কি? এই নিমিত্তই নিতান্ত শৈশবাবস্থায় মাতৃবিয়োগ হইলে শিশুও অচিরে কালগ্রাসে পতিত হয় অথবা নিতান্ত দুর্ব্বল শরীরে বিমর্ষভাবে কথঞ্চিৎ

জীবিত থাকে। মাতৃহীন শিশু নিতান্তই হতভাগ্য, সে জীবন্মৃত। দাস দাসী ও অপরাপর আত্মীয় স্বজন দ্বারা শিশু সন্তানের প্রতিপালন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। কেনই হইবে? সুশীতল বৃষ্টিজল ব্যতীত তড়াগ ও স্রোতস্বতীর প্রচুর বারি কখনও কি চাতকের পিপাসার শান্তি বিধানে সমর্থ হয়? একমাত্র চন্দ্রমা আকাশমার্গে সমুদিত হইয়া নৈশ অন্ধকার দূরীভূত করিয়া দেয়, কিন্তু লক্ষ লক্ষ তারকাস্তবক কিছুই করিতে পারেনা। দাস দাসী ও অপরাপর স্বজন দ্বারা প্রতিপালিত হইলে অনেক সময়ে শিশুর জীবন রক্ষা পায় বটে, কিন্তু সে শিশু সহজেই দুর্ব্বল এবং বালস্বভাবসুলভ স্ফূর্ত্তি বিবর্জ্জিত হইয়া থাকে। আমেরিকার জল বায়ু ও মৃত্তিকায় যে বৃক্ষ সুন্দররূপে বর্দ্ধিত হয়, বিদেশে সেই বৃক্ষ বহু যত্নে রক্ষিত হইলেও সুচারুরূপে বর্দ্ধিত হইতে পারেনা, ইহা সকলেই অবগত আছেন। আর দাস দাসী রাখিবার গুরুতর ভারবহন সকলের অবস্থার উপযোগীও নহে।

মাতৃস্নেহের কি অনির্ব্বচনীয় মধুময় ভাব! উহা সন্তানের সৌন্দর্য্য অথবা অসৌন্দর্য্যের বিচার করে না। স্নেহরূপ স্পর্শমণির সংস্পর্শে অতি কুৎসিত শিশুও জননীর নিকট তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় মনোহর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মাতৃস্নেহ সন্তানের দোষগুণের পক্ষপাতী নহে; কি দুর্গন্ধময় অপরিষ্কৃত ভূমি, কি সুগন্ধি পুষ্প সংযুক্ত রম্য স্থান, মেঘমালা সর্ব্বত্র যেরূপ সমভাবে বারি বর্ষণ করে, পরম স্নেহময়ী জননীও তদ্রূপ কি গুণবান্ কি নির্গুণ সকল সন্তানেরই প্রতি অপক্ষপাতে অকাতরে স্নেহবারি বর্ষণ করিতে পরাঙ্মুখী হননা, প্রত্যুত নির্গুণ ও অকৃতী

সন্তানের প্রতিই তাঁহার অপেক্ষাকৃত অধিকতর স্নেহভাব প্রকাশ পায়। এরূপ নিঃস্বার্থ স্নেহ ভূমণ্ডলে আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। জননী নিজের সুখ দুঃখে সম্পূর্ণ উদাসীন। তিনি আপনার আহার নিদ্রা ও সুখাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া সন্তানের দুঃখ বিমোচন ও তাহার সুখ সাচ্ছন্দ্য বিধানে সর্ব্বদা তৎপর থাকেন ; এমন কি নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াও সন্তানের মঙ্গল বিধান করেন। জননী কায়মনোবাক্যে সন্তানের হিতসাধন ব্রতে ব্রতিনী। এস্থলে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, জননী কায়মনোবাক্যে কিরূপে সন্তানের হিতসাধন করেন? সন্তানের সেবাশুশ্রূষার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম ও কায়িক ক্লেশ সহ্য করিতে হয় বটে, এবং আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ এবং সদুপদেশ প্রদান করিয়া তিনি সন্তানের হিতসাধন করেন, ইহাও সত্য। কিন্তু মনদ্বারা তিনি কিরূপে সন্তানের মঙ্গল বিধান করেন? তাহার উত্তর এই :—তিনি মনে মনে নিরন্তর সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন এবং এইরূপ কামনাই সন্তানের শুভজনক। মনে মনে শুভ কামনা করিলে যে অন্যের শুভ সম্পাদন করিতে পারা যায়, মহাভারতে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে :—

"মনসা স্নেহযুক্তেন যন্মাং স্মরসি মাধব।
শাবকা ইব কূর্ম্মীণাং তেন জীবামহেবয়ম্ ॥"

যুধিষ্টির বলিতেছেন, হে মাধব! তুমি স্নেহযুক্ত অন্তঃকরণে যে আমাদের বিষয় ভাবিয়া থাক, কূর্ম্মশাবকের ন্যায় আমরা তাহাতেই জীবিত থাকি। প্রবাদ আছে, যদি কূর্ম্মশাবকগণ মাতৃবিযুক্ত হয়, আর যদি তাঁহাদের মাতা জীবিত থাকিয়া শাবক-

গুলির বিষয় চিন্তা করিতে পায়, তবে শাবকগুলিও জীবিত থাকে, আর যদি কূর্ম্মমাতার প্রাণবধ করা যায়, তবে শাবকগুলিও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। ঐকান্তিক কামনা দ্বারা অন্যের শুভাশুভ সম্পাদন করা ইচ্ছা শক্তির কার্য্য। ইংরাজিতে ইহাকে will force বলে। এই ইচ্ছাশক্তি (will force) প্রভাবেই ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের প্রবর্ত্তয়িতা বাবর স্বীয় পুত্র হুমায়ুনের সাঙ্ঘাতিক পীড়া নিজের শরীরে সংক্রামিত করাইয়া হুমায়ুনের আরোগ্য সম্পাদন এবং নিজের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন। যযাতি ও তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র পুরু এই উভয়ের মধ্যে যে জরা ও যৌবনের বিনিময় হইয়াছিল, তাহাও বোধ হয় এই ইচ্ছা শক্তির কার্য্য। এক্ষণে বুঝিতে পারা গেল, জননী কিরূপে কায়-মনোবাক্যে সন্তানের শুভ সাধন করেন। ফলতঃ জননীর স্নেহের বিষয় লিখিয়া শেষ করিবার নহে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ উহা বুঝিয়া লইবেন। "রাম রাবণয়োর্যুদ্ধং রাম রাবণয়োরিব" রাম রাবণের যুদ্ধ রাম রাবণের যুদ্ধের তুল্য। সেই রূপ আমরা অনায়াসেই বলিতে পারি, মাতৃস্নেহ মাতৃস্নেহেরই তুল্য; পার্থিব অন্য কোন পদার্থের সহিত উহার সাদৃশ্য নাই।

পরমপিতা পরমেশ্বর জননীর অন্তঃকরণে এইরূপ অলোক-সামান্য অনুপম স্নেহরাশি অর্পণ করিয়াছেন বলিয়াই তিনি সন্তান প্রতিপালনের সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্রী। এই স্নেহের প্রভাবে সন্তান প্রসবের পরক্ষণেই তিনি তাদৃশ দুর্ব্বিষহ প্রসব যন্ত্রণা একবারে ভুলিয়া যান এবং নবীভূত উৎসাহ সহকারে নবপ্রসূত সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণে অগ্রসর হন। পূর্ণশশী দর্শনে সাগরের জল যেরূপ

উদ্বেল হইয়াউঠে, সন্তানের অসেচনক মুখচন্দ্র নিরীক্ষণে জননীর হর্ষনীরও সেইরূপ উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকে। অপরিমিত স্নেহসুধার উচ্ছলন স্বরূপ স্তন্য আসিয়া তাঁহার শরীরে সঞ্চারিত হয় এবং তিনি সেই অমৃতরস পান করাইয়া বালকের পুষ্টি সাধন করিতে থাকেন। বাস্তবিক স্তন্য দুগ্ধ বালকের পক্ষে সাক্ষাৎ অমৃত স্বরূপ। উহা যেমনই লঘুপাক তেমনই পুষ্টিকর, সুতরাং উহাতে বালকের কোন অপকার হয়না অথচ শরীরের পুষ্টি হইতে থাকে। গোদুগ্ধ অথবা অন্য কোনরূপ দুগ্ধ অপেক্ষাকৃত গুরুপাক। এই নিমিত্ত স্তন্য পান করিলে বালক যেমন সুস্থ ও সবল হয়, অন্য দুগ্ধে সেরূপ হইতে পারেনা। এই নিমিত্তই লোকে সচরাচর আপনার বল ও সামর্থ্যের গর্ব্ব করিবার সময় বলিয়া থাকে, "আমি কি মাতৃস্তন্য পান করি নাই?" অত্যন্ত শৈশবকালে মাতৃবিয়োগ হইলে, যে অধিকাংশ শিশু কালগ্রাসে পতিত হয় অথবা নিতান্ত কৃশকায় হইয়া বাঁচিয়া থাকে, মাতৃদুগ্ধের অভাবই তাহার প্রধান কারণ। মাতৃস্তন্য ব্যতীত অন্য স্ত্রীলোকের স্তন্য বিশেষ সাবধানতা সহকারে পান না করাইলে হিতে বিপরীত হইয়া উঠে। ইউরোপীয় জাতিগণ বালককে মাতৃস্তন্য পান না করাইয়া বহুব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক বিশেষ সাবধানে সবল শরীর, সমকাল প্রসূত অন্য স্ত্রীলোকের (wet nurse) স্তন্য বালককে পান করিতে দেন। কিন্তু এরূপ ব্যয় সক্ষম কয় জন লোক আমাদের দেশে বিদ্যমান আছেন? বালককে অন্য স্ত্রীলোকের স্তন্য পান করাইতে হইলে বিশেষ সতর্কতা ও বিবেচনা আবশ্যক। যাহার স্তন্য বালককে পান করাইতে হইবে, সেই

স্ত্রীলোক যদি রুগ্না হয় অথবা বালকের মাতার সমকাল প্রসূতা ও সমবয়স্কা না হয়, তবে বালকের নানা কঠিন পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা চিকিৎসকেরা বলিয়া থাকেন। তাই বলিতেছিলাম, মাতৃস্তন্য বালকের পক্ষে সাক্ষাৎ অমৃত স্বরূপ। জননীদেবী পরম যত্নে বালককে সেই অমৃত রস প্রদানে তাহার ক্ষুৎপিপাসা শান্তি ও শারীরিক পুষ্টি সম্পাদন করেন বটে, কিন্তু তাহাতে প্রসূতির শরীর ক্ষয় হয়। জননী কেবল স্তন্য পান করাইয়া শরীর ক্ষয় করেন এমন নহে; সন্তানের শুভ কামনায় নানাবিধ ব্রতোপবাসের কঠোর ক্লেশ সহ্য করাতেও তাঁহার শরীর কৃশ হইতে থাকে; কিন্তু সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই। নিজের শরীর ক্ষয় স্বীকার করিয়া অন্যের পুষ্টি সাধন ও মঙ্গল বিধান করেন, জগতে এমন হিতৈষী বন্ধু কয় জন দেখিতে পাওয়া যায়?

যেরূপ সূর্য্যরশ্মির অনুপ্রবেশ দ্বারা শুক্ল পক্ষের শশধর দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, জননীর স্নেহগর্ত্ত পরিপোষণ গুণে শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি ও সেইরূপ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত ও সবল হইতে থাকে। যখন শিশুর বদন মণ্ডলে মুক্তাবিনিন্দিত দশন পংক্তির উদ্গম হয়, যখন সে আধ আধ স্বরে সুধা বর্ষণ করিয়া দুই একটী কথা বলিতে শিখে, যখন সে পানোন্মত্তের ন্যায় হেলিয়া দুলিয়া অল্প অল্প চলিতে আরম্ভ করে, তখন মাতার হৃদয়ে কি অপার আনন্দেরই উদয় হয়!!! তিনি আনন্দ গদ্গদ স্বরে তাহাকে নূতন নূতন কথা উচ্চারণ করিতে শিখান, তাহার নবনীত-কোমল হস্তাঙ্গুলি ধারণ করিয়া পাদবিক্ষেপ অভ্যাস করান এবং দেবতা ও গুরুজনকে প্রণাম করিতে শিখাইয়া বিপুল প্রীতি

অনুভব করেন। তিনি হর্ষবিকম্পিত হস্তে তাহার আভুগ্ন কেশ-কলাপ যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া দেন এবং সুনীল সমুজ্জ্বল নয়ন যুগলে অঞ্জন রেখা পরাইয়া দিয়া ভূলোকে দ্যুলোকের সুখ উপভোগ করেন। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে সন্তান পীড়িত হয়, তাহা হইলে তাঁহার দুঃখের ইয়ত্তা থাকেনা। তিনি নিরন্তর নিদারুণ মর্ম্মপীড়ায় প্রপীড়িত হইতে থাকেন। জগৎ অন্ধকারময় ও জীর্ণ অরণ্যের ন্যায় বোধ হয়। পাগলিনীর ন্যায় রুগ্ন শিশুর শয্যাপার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক আহার নিদ্রা বর্জ্জন করিয়া তিনি প্রাণপণে সন্তানের সেবা শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হন এবং একাগ্রমনে শিশুর আরোগ্য কামনায় সেই বিপদ্ভঞ্জন জগদীশ্বরের উপাসনা করিতে থাকেন। যদি সৌভাগ্য ক্রমে মেঘনির্ম্মুক্ত শশধরের ন্যায় শিশু রোগনির্ম্মুক্ত হইয়া উঠে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ জননীর শোকান্ধকার দূরীভূত হইয়া যায়, তিনি আহ্লাদ রাখিবার স্থান পাননা এবং কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে জগদীশ্বরের শত শত ধন্যবাদ দিতে থাকেন। কিন্তু যদি দুর্ভাগ্যক্রমে শিশুর প্রাণান্ত হয়, যদি তাঁহার মানসসরোবরের মনোজ্ঞ কমলটী চিরদিনের মত শুষ্ক হইয়া যায়, তাহা হইলে জননীর হৃদয়ে যে বিষম শোকের উদ্রেক হয় তাহা সামান্য লেখনীতে বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। শিশুর প্রাণ বায়ুর সহিত তাঁহারও জীবন বায়ু বহির্গত হইয়া যায়, কেবল রক্তমাংসময় দেহ পিণ্ডটী পড়িয়া থাকে মাত্র। তাঁহার তৎকালীন পাষাণভেদী আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলে এবং শোকসন্তপ্ত হস্তে বক্ষে আঘাত দর্শন করিলে কোন্ পাষণ্ডের পাষাণময় হৃদয় করুণরসে দ্রবীভূত না হয়? কিন্তু কেবল কিছুদিনের জন্য আর্ত্তনাদ ও

বক্ষে করাঘাত করিয়াই যে তাঁহার শোকের শান্তি হয় এরূপ নহে। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর সন্তানের রক্তমাংসময় দেহ প্রদীপ্ত চিতাগ্নিতে ভস্মসাৎ হইলেও জননীর স্নেহস্বচ্ছ চিত্তমুকুরে প্রতিবিম্বিত শিশুর কমনীয় মূর্ত্তির উচ্ছেদ সাধন হয় না এবং বক্ষঃস্থলবাহী অশ্রুজল বর্ষণেও চিত্তক্ষেত্রে প্রস্তররেখাবৎ অঙ্কিত সেই মোহনমূর্ত্তিও ধৌত হইয়া যায় না। শয়নে স্বপনে সেই মনোহর মূর্ত্তি স্মৃতিপথে উদিত হইয়া সজীব অবস্থাতেই তাঁহাকে দারুণ শোকানলে দগ্ধ করিতে থাকে এবং যতদিন পর্য্যন্ত প্রজ্বলিত চিতানলে দেহ ভস্মীভূত হইয়া না যায়, ততদিন আর তাঁহার শোক বহ্নি নির্ব্বাপিত হয় না। যথার্থই—

"চিতা চিন্তা দ্বয়োর্ম্মধ্যে চিন্তা নাম গরীয়সী
চিতা দহতি নির্জ্জীবং চিন্তা প্রাণসমং বপুঃ॥"

অহো! মাতার কি আশ্চর্য্য মায়া!!! জননী ইহজীবনে কখনও পুত্রশোক মন হইতে অপসারিত করিয়া দিতে পারেন না। আর আর সকলে ক্ষণকাল মাত্র শোক প্রকাশ করিয়া নিবৃত্ত হয়। "নৈষধচরিত" গ্রন্থে যখন নলরাজা হংসকে ধরিয়াছিলেন, তখন হংস আপনার মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া যে বিলাপ করিয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে একটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"মুহূর্ত্তমাত্রং ভব নিন্দয়া দয়া
সখাঃ সখায়ঃ স্রবদশ্রবোমম।
নিবৃত্তিমেষ্যন্তি পরং দুরুত্তর
স্তুয়ৈব মাতঃ সুতশোকসাগরঃ॥"

আমার দয়াপর বন্ধুগণ আমার মরণে মুহূর্ত্তমাত্র অশ্রুপাত ও

সংসারের নিন্দা করিয়া নিবৃত্ত হইলেন। কিন্তু মা! সুতশোক-সাগর কেবল তোমার পক্ষেই দুস্তর হইবে অর্থাৎ তুমিই যাবজ্জীবন শোক করিতে থাকিবে।

সকলেই অবগত আছেন, যাহার যেরূপ স্বভাব কিছুতেই তাহার পরিবর্ত্তন হয় না। ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠ প্রভৃতি নানা উপায় অবলম্বন করিলেও যাহার যেরূপ স্বভাব, তাহার পরিবর্ত্তন করা বড়ই কঠিন বোধ হয়।

"ন ধর্ম্মশাস্ত্রং পঠতীতি কারণং
ন চাপি বেদাধ্যয়নং দুরাত্মনঃ
স্বভাব এবাত্র তথাতিরিচ্যতে
যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ॥"

যদিও স্বভাবের পরিবর্ত্তন করা এরূপ কঠিন ব্যাপার, তথাপি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই প্রসূতি স্বভাব পরিবর্ত্তনের অভ্যাস করেন। যদি তিনি স্বভাবতঃ কলহপ্রিয়া ও কটুভাষিণী হন, তবে তিনি অতঃপর সহজে কলহে প্রবৃত্ত হইতে অথবা অকারণে কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া লোকের মনে বেদনা প্রদান করিতে আর সাহস করেন না। পাছে কেহ মনোদুঃখে ব্যথিত হইয়া সন্তানকে অভিশাপ দেয়, পাছে কোন পাপকর্ম্ম করিয়া ঈশ্বরের বিরাগভাজন হইলে সন্তানের কোন অনিষ্ট ঘটে, তিনি সর্ব্বদাই এই ভয়ে ব্যাকুল। স্বীয় প্রকৃতির অনুমোদিত না হইলেও তিনি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে এবং আন্তরিক না হইলেও প্রকাশ্যে মিষ্ট কথা বলিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিতে অভ্যাস করেন। প্রকৃতির বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে কতই

ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়; সন্তানস্নেহপ্রণোদিত হইয়াই তিনি এরূপ ক্লেশ সহ্য করেন। অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যাইবে, পৃথিবীর দুষ্টস্বভাব ও পাপিষ্ঠ নারীকুলের অধিকাংশই সন্তানসন্ততিবিহীন, সুতরাং তাহারা নির্ভয়ে যথেচ্ছাচরণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না।

অলঙ্কার রমণীহৃদয়ের সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয় সামগ্রী; অলঙ্কার ইহাদের ইষ্টমন্ত্র বেশবিন্যাস ও অলঙ্কার লইয়া নারী জাতি সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত। কিরূপে অলঙ্কার লাভ করিব, কিরূপে অঙ্গের সৌষ্ঠব সাধন করিব, এই বিষয়ের চিন্তাতেই ইহারা অধিকাংশ সময় যাপন করে। অলঙ্কার পরিধান করিতে না পাইলে, মনুষ্যজন্ম বিফল হইল, ইহারা এইরূপ ভাবিয়া থাকে। কিন্তু সন্তানস্নেহের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা!!! সন্তানস্নেহ অনায়াসেই সেই প্রবল অলঙ্কার লোভকেও জননীর অন্তঃকরণ হইতে অপসারিত করিয়া দেয়। জননীর আর নিজের বেশভূষার প্রতি দৃষ্টি নাই, নিজের সৌষ্ঠব সাধনের তাদৃশ ইচ্ছা নাই। নিজের বিলাসিতায় বীতস্পৃহ হইয়া তিনি সন্তানের বেশভূষায় মনোযোগ দেন এবং সন্তানকে সুচারু বেশভূষায় সজ্জিত দেখিলে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন। ইহা কি সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয়!!!

কিন্তু সন্তানকে বস্ত্রালঙ্কারে সুশোভিত করিবার সুযোগ সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। অন্নবস্ত্রহীন দরিদ্র লোকেরা কিরূপে সন্তানকে বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিবে? কিন্তু তাহা বলিয়া কি তাহারা সন্তানকে স্নেহ করে না? বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিলেই

কি স্নেহ প্রকাশ পায়, অন্যরূপে কি স্নেহ করা যায় না?' স্নেহ প্রকাশ সহস্র প্রকারে হইতে পারে। মুখচুম্বন, মিষ্টবাক্য-প্রয়োগ, আদর, অবেক্ষা ইত্যাদি দৈনন্দিন কার্য্য স্নেহবত্তার সুস্পষ্ট লক্ষণ। কিন্তু আহারের সময় যেরূপ স্নেহ প্রকাশের সুযোগ উপস্থিত হয়, এরূপ আর কখনই হয় না। স্নেহবান্ ব্যক্তি স্নেহের পাত্রকে সুখাদ্য দ্রব্যের অন্ততঃ কিয়দংশ প্রদান না করিয়া কখনই একাকী ভোজন করিতে পারেন না; অনেক সময়ে উত্তম দ্রব্য আপনি ভোজন না করিয়া প্রিয়পাত্রকেই অর্পণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন। একদিন মহানুভব মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্র রায় একটী উৎকৃষ্ট আম্রফল পাইয়াছিলেন। তিনি উহা স্বয়ং না খাইয়া স্নেহবশতঃ তাঁহার প্রিয়পুত্র শিবচন্দ্রকে দেন। শিবচন্দ্র সেটী স্বয়ং খান নাই, স্বীয় পুত্রকে দেন। বালকটী আম্র খাইতে আরম্ভ করিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পৌত্রকে আম্র ভক্ষণ করিতে দেখিয়া শিবচন্দ্রকে কহিলেন, "বৎস! আম্রটী আমাকে খাইতে দিলেনা, আপনি খাইলে?" শিবচন্দ্র আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, "পিতঃ! আম্রটী ত আপনি আমাকে ভক্ষণ করিতে দিয়াছিলেন, আমি উহা ভক্ষণ করি নাই, আমার পুত্রকে দিয়াছি। তবে আপনি কহিলেন, 'আম্রটী আমাকে খাইতে না দিয়া আপনি খাইলে' এই কথা কত দূর সঙ্গত হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম না।" কৃষ্ণচন্দ্র কহিলেন, "বৎস! বুঝিতে পারিলে না? আম্রটী তোমার পরম স্নেহাস্পদ পুত্র ভক্ষণ করিয়াছে, ইহাতে তোমারই ভক্ষণ করা হইল। তুমিও আমার সেই পরম প্রিয় পুত্র, তুমি ভক্ষণ করিলে আমারই ভক্ষণ করা

হইত, কিন্তু তাহা হয় নাই।” আমাদের দেশে একটী সুন্দর গান গীত হইয়া থাকে; সেটীও প্রগাঢ় স্নেহের সুন্দর পরিচায়ক। রাখালসখা শ্রীদাম কালিয়হ্রদনিমগ্ন শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন :—

“একবার আয় ভাই
নফর শ্রীদাম ডাকে দেখা দেবে রাখালের জীবন কানাই।
বনে বনে বুলে বুলে
এনেছি বন ফল তুলে
রেখেছি ধড়ার অঞ্চলে
মেটো বলে খাই নাই॥”

বনে ভ্রমণ করিতে করিতে ফল তুলিয়া আহার করিতে গিয়া দেখিলাম ফলটী বড়ই সুমিষ্ট। আর আহার না করিয়া ধড়ার অঞ্চলে তোমার জন্য বাঁধিয়া আনিয়াছি। ইহা কি সামান্য স্নেহের কর্ম্ম !!! ইহাতে যেরূপ স্নেহ প্রকাশ করা হইয়াছে, প্রভূত ধন এবং বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিয়াও সেরূপ করিতে পারা যায় না। জননী সন্তানের প্রতি পদে পদে এইরূপ স্নেহপ্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনি অর্দ্ধাশন এবং উপবাস করিয়াও সন্তানের ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। সুখাদ্য দ্রব্যটী সন্তানের জন্য যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দেন এবং আহার করিতে করিতে কোন দ্রব্য সুস্বাদ বোধ হইলে, আপনি আহার না করিয়া তৎক্ষণাৎ সন্তানকে প্রদান করেন, ইহা কাহার অবিদিত আছে?

জননীর এবম্বিধ সুশীতল স্নেহসলিলসেচনে বালক ক্রমে ক্রমে উপচিতকায় হইতে থাকে। যখন সন্তান কিছু বড় হয়,

তখন জননী আর স্থির থাকিতে পারেন না। স্নেহের পুত্তলীটী কি রূপে বিদ্যালাভ করিয়া মনুষ্যজন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিবে, কি রূপে সে জ্ঞানরত্ন উপার্জ্জন করিবে, তখন তিনি সেই বিষয়ে যত্নবতী হন। পাঠাভ্যাস করিবার জন্য সন্তানটী যথাসময়ে বিদ্যালয়ে প্রেরিত হয়। বালককে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া জননী নিশ্চিন্ত থাকেন না, সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং সুশিক্ষা ও সদুপদেশ প্রদান করিয়া বালকের সুকোমল চিত্তক্ষেত্রে জ্ঞান ও ধর্ম্মের বীজ বপন করিতে থাকেন। জননী যদি স্বয়ং সুশিক্ষিতা হন, তবেত মনিকাঞ্চন যোগ। তিনি সুশিক্ষা প্রদান ও সদুদাহরণ প্রদর্শন দ্বারা কুমারের অন্তঃকরণ অচিরেই জ্ঞান ও ধর্ম্মাভরণে বিভূষিত করিয়া তুলেন। বাল্যকালে সন্তান জননীর নিকট যেরূপ শিক্ষালাভ ও উদাহরণ দর্শন করে, তাহা তাহার অন্তঃকরণে প্রস্তররেখাবৎ অঙ্কিত হইয়া যায়, কখনই অপনীত হয় না। গলিত ধাতুকে পিটিয়া যথেচ্ছ আকারের সামগ্রী করা যাইতে পারে, কিন্তু কঠিন ধাতুতে সেরূপ হয় না। বালকের অন্তঃকরণ গলিত ধাতুর ন্যায় কোমল, উহাকে যে দিকে যে রূপে চালিত কর, উহা সেই দিকে সেই রূপেই চালিত হয়। পণ্ডিতাগ্রগণ্য সার্ উইলিয়ম্ জোন্‌স, বীরপুঙ্গব নেপোলিয়ন্ বোনাপার্ট মহানুভব জর্জ ওয়াসিংটন্, ইঁহারা সকলেই বাল্যকালে জননীর নিকট সুশিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং সেই সুশিক্ষাবলেই ইঁহাদের নাম ভূমণ্ডলে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। আমাদের দেশে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ধ্রুবোপাখ্যান অবগত আছেন। মহামতি ধ্রুব জননীর উপদেশ বলেই আধ্যাত্মিক জগতে এতাদৃশী

উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন বলিতে হইবে। পিতা ও বিমাতা কর্ত্তৃক অবমাননাগ্রস্ত হওয়াতে ধ্রুব মর্ম্মান্তিক যাতনায় অধীর হইয়া জননী সুনীতির নিকট অভিযোগ করেন। পুত্রের প্রতি সপত্নী ও স্বামীর এতাদৃশ বিসদৃশ আচরণের কথা শ্রবণ করিয়া সুনীতি কিছু মাত্র ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না, ধীরে ধীরে পুত্রকে উপদেশ দিলেন :—

"সুশীলোভব ধর্ম্মাত্মা মৈত্রঃ প্রাণিহিতে রতঃ।
নিম্নং যথাপঃ প্রবণাঃ পাত্রমায়ান্তি সম্পদঃ॥"

জননীকণ্ঠনিঃসৃত এই উদার বাক্যগুলি মহাত্মা ধ্রুবের হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিল। তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। ধন, ঐশ্বর্য্য ও সাংসারিক সুখ কিঞ্চিৎকর ভাবিয়া তিনি ধর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন এবং কঠোর তপশ্চরণ করিতে করিতে সেই পরমব্রহ্মে লীন হইলেন।

সচরাচর এদেশীয় কথক মহাশয়গণের আখ্যাত জটিলোপাখ্যান এস্থলে না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। জটিল অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান। অতি অল্পবয়সেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। জটিলের মাতা নানা ক্লেশসহ্য করিয়া পরম যত্নে পিতৃহীন শিশুটীর লালন পালন করিতে লাগিলেন। যথাকালে জটিল বিদ্যাশিক্ষার্থ একটী অধ্যাপকের নিকট প্রেরিত হইলেন। জটিল প্রতিদিন যথাসময়ে অধ্যাপক মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া পাঠাভ্যাস করিতেন, পাঠাভ্যাস হইলে পুনর্ব্বার বাটীতে ফিরিয়া আসিতেন। পথিমধ্যে একটী বৃহৎ অরণ্য ছিল; জটিল অল্পবয়স্ক, সুতরাং অরণ্য অতিক্রম করিবার সময় তাঁহার মনে বড় ভয় হইত। একদা

তিনি মাতাকে কহিলেন, "মা বন দিয়া একাকী যাইবার সময় আমার বড় ভয় হয়।" মাতা কহিলেন, "বাছা জটিল! তুমি যখন ভয় পাইবে, তখন বনমালী দাদাকে ডাকিও, তাহা হইলে আর ভয় থাকিবে না।" মাতৃভক্ত সরলহৃদয় জটিল মাতার বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া বনের নিকটে গমনপূর্ব্বক অকপট ভাবে "বনমালী দাদা" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। ভক্তবৎসল বনমালী দাদাও মাতৃভক্ত সরলহৃদয় বালকের অকপট আহ্বানে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারিলেন না। নবজলদশ্যামতনু পীতাম্বর চূড়াধড়াশোভিত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত হইয়া বালককে ক্রোড়ে লইয়া বন পার করিয়া দিলেন। জটিল প্রতিদিন এইরূপে বনমালী দাদাকে ডাকিতেন এবং বনমালী দাদাও তাঁহাকে বন পার করিয়া দিতেন। অধিক লিখিবার আবশ্যকতা নাই, এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে, জটিল বাল্যাবস্থায় বনমালী দাদার সাহায্যে সামান্য বন পার হইতেন, আবার সেই বনমালী দাদার আশ্রয় পাইয়াই কালসহকারে দুস্তর ভবার্ণব পারেও সমর্থ হইয়াছিলেন। মাতার সদুপদেশই তাঁহাকে হরিপ্রেমসাগরে নিমগ্ন করাইয়াছিল সন্দেহ নাই। যদি জটিলের মাতা জটিলের সুকোমল চিত্তভূমিতে হরিভক্তির বীজ বপন না করিতেন, তাহা হইলে উহাতে যে কণ্টকবৃক্ষের বীজ অঙ্কুরিত হইত না কে বলিতে পারে?

আবার দেখুন, সুমিত্রার হৃদয় বলেই লক্ষ্মণের চরিত্র গঠিত হইয়াছিল। রামচন্দ্রের বনগমনকালে নিঃস্বার্থহৃদয়া সুমিত্রা অসঙ্কুচিত চিত্তে লক্ষ্মণকে রামের অনুগমন করিতে এবং

সর্ব্বতোভাবে রামের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহা কি সুমিত্রার সামান্য উদারচিত্ততার পরিচায়ক? লক্ষ্মণও সম্পূর্ণরূপে সুমিত্রার সেই উদার ভাবের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি পদে পদে সৌভ্রাত্রের যেরূপ প্রগাঢ় পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা কস্মিন্ কালে কেহ বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। যতদিন ভারতবর্ষে রামায়ণের নাম থাকিবে, তত দিন লক্ষ্মণের নাম সৌভ্রাত্রের আদর্শস্বরূপ হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই।

মহাভারতের অন্তর্গত বিদুলা সঞ্জয় সংবাদটী একবার স্মরণ করুন। সঞ্জয় প্রবল শত্রু সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু মাতার তেজোগর্ভ উৎসাহবাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া অবশেষে সিন্ধুরাজকে পরাজিত এবং পৈতৃক রাজ্যের উদ্ধার সাধন করেন।

ইতিহাস পাঠক ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন, রাজপুতানা বীরপ্রসবিনী। রাজপুতগণের শৌর্য্যবীর্য্য ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। রাজপুতগণ রণক্ষেত্রে শত্রুকে কখনই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নাই। সমরাঙ্গণে সশস্ত্র প্রাণত্যাগ করাই ইঁহাদের শ্লাঘার বিষয় ছিল। তাঁহাদের বীরত্বের বিষয় স্মরণ করিলে অদ্যাপি শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে এবং এই জীবন্মৃত দুর্ব্বল দেহের মধ্যেও শোণিতস্রোত দ্রুতবেগে পরিচালিত হয়। রাজপুতগণের এই অলোকসামান্য বীরত্বের মূল কারণ কি? অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, তেজস্বিনী রাজপুত মহিলাগণের উৎসাহবায়ুসংযোগেই রাজপুতগণের বীরত্ববহ্নি

সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠিয়াছিল। রাজপুত মহিলাগণ উৎসাহবাক্যে স্ব স্ব শিশুসন্তানের অন্তঃকরণে বীরত্বভাব উদ্ভূত করিয়া দিতেন, আবশ্যকতা হইলে চামুণ্ডার ন্যায় রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধ করিতেন এবং শত্রুকর্ত্তৃক বিজিত হইলে শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ না করিয়া প্রদীপ্ত চিতাগ্নিতে দেহ ভস্মসাৎ করিতেন। এই সকল বীরপত্নীগণের তনয় যে মহাবীর হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

ফলতঃ মাতা প্রথমে শিশুর ভবিষ্য চরিত্রচিত্রের অঙ্কন করিয়া দেন, পিতা অথবা গুরু অবশেষে তাহা বিবিধ বর্ণে সমুজ্জ্বল করেন মাত্র। বাল্যকালে যখন আমাদের অনুকরণ বৃত্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ থাকে, তখন আমাদের অধিকাংশ সময়ই মাতার নিকট থাকিয়া যাপিত হয়, সুতরাং মাতার গুণ অথবা দোষ আমরা সহজেই শিক্ষা করিয়া থাকি। বাল্যকালে মাতা যদি আমাদিগকে সুশিক্ষা দেন, তাহা আমাদের অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশে স্থান পায়, কারণ তিনি অত্যন্ত স্নেহ সহকারে শিক্ষা দেন। এই নিমিত্তই ব্যক্তি বিশেষ অথবা জাতি বিশেষের উন্নতি সাধন পক্ষে দেশমধ্যে সুশিক্ষিতা রমণীর একান্ত আবশ্যকতা, নতুবা উন্নতির আশা অতি বিরল।

কালসহকারে সন্তান যৌবনসীমায় উপনীত এবং বিদ্বান্, যশস্বী, জ্ঞানালোকসম্পন্ন, কৃতী ও উপার্জ্জনক্ষম হইলে জননীর আহ্লাদের আর সীমা থাকে না। আহ্লাদে তাঁহার হৃদয় নৃত্য করিতে থাকে। স্নেহবারিসেকে সম্বর্দ্ধিত পুত্রতরুকে সুফল-শালী দেখিলে জননীর যে অপার আনন্দ হয়, সর্ব্বান্তর্যামী

জগদীশ্বর ব্যতিরেকে তাহা কে বুঝিবে? কিন্তু যদি পুত্র মূর্খ, দুর্নীতিপরায়ণ ও অকৃতী হয়, তাহা হইলে তিনি এক কালে দুঃখসাগরে নিমগ্না হন, তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে। কিন্তু পুত্রের মূর্খতা, দুর্নীতিপরায়ণতা বা অকৃতিত্ব কিছুতেই পুত্রের প্রতি মাতার আন্তরিক স্নেহরাশির লাঘব সম্পাদন করিতে পারে না। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও পুত্রের প্রতি মাতৃস্নেহের কিছু-মাত্র শৈথিল্য হয় না। পশুপক্ষ্যাদি ইতর প্রাণিগণের বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহাদের জননীর স্নেহ বিলোপ প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু মানবজননীর স্নেহ চিরকাল সমভাবেই থাকিয়া যায়। তবে পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক হইলে সকল বিষয়ে বাল্যকালের ন্যায় আর জননীর সাহায্যের আবশ্যকতা হয় না, অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক পুত্র কন্যাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ আবশ্যক হইয়া উঠে এবং বার্দ্ধক্য আসিয়া মাতার পূর্ব্বশক্তিহ্রাস করে; এই জন্যই প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের প্রতি জননীর স্নেহের অল্পতা হইয়াছে বলিয়া আপাততঃ বোধ হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, জলদজালে আবৃত সূর্য্যরশ্মির-ন্যায় উহা চিরকাল সমভাবেই থাকে।

ফলতঃ জননীর ন্যায় নিঃস্বার্থ স্নেহ আর কাহার দেখিতে পাওয়া যায়? আহা! মাতার যেরূপ স্নেহময়ী মূর্ত্তি, "মা", নামটীও তেমনি মধুর!!! যখন আমরা রুগ্ন শয্যায় শায়িত থাকিয়া পীড়ার ঘোরতর যন্ত্রণায় দগ্ধীভূত হই, তখন মাতৃদেবীর কোমল করপদ্ম স্পর্শ করিয়া কতই তৃপ্তিলাভ এবং "মা" নাম উচ্চারণ করিয়া রোগের যন্ত্রণার লাঘব করি। যখন বিজন প্রান্তরমধ্যে পথিক নিদাঘের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে তাপিত হইয়া গলদঘর্ম্ম কলেবর ও পিপাসায়

শুষ্ককণ্ঠ হয়, যখন সে প্রতি পদবিক্ষেপে মৃত্যুর বীভৎস মূর্ত্তি দর্শন করিতে থাকে, তখন সে "মা" বলিয়া তারস্বরে চীৎকার করে এবং ক্ষণকালের জন্য আসন্ন বিপদ্ ভুলিয়া যায়। যখন উত্তাল-তরঙ্গমালাসঙ্কুল ফেনপুঞ্জসমাকীর্ণ প্রবলঝটিকাহত সমুদ্রের উপর একখানি দোলায়মান অর্ণবপোতে বসিয়া মনুষ্য প্রতিক্ষণে প্রাণের আশায় জলাঞ্জলি দেয়, তখন মাতার কমনীয় মূর্ত্তি তাহার স্মৃতি-পথে উদিত হইয়া মেঘাবৃত রজনীতে ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক আলো-কের ন্যায় মুহূর্ত্তের জন্য বিষাদ্তমসাচ্ছন্ন অন্তঃকরণে সুখের আলোক অনুভব করায়।* যখন আমরা প্রবাসে থাকিয়া নানা ক্লেশ সহ্য করি এবং আহারের ক্লেশে ও নানা দুর্ভাবনায় আমা-দের শরীর কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট হয়, তখন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণারূপিণী মাতৃদেবীর স্নেহ স্মরণ এবং তাঁহার মধুময় নাম উচ্চারণ করিয়া আমরা অনেক আশ্বস্ত হই এবং মন্দীভূত উৎসাহ নবীভূত হইয়া আমাদের দুর্ব্বল শরীরে বল সঞ্চারিত করে। ফলতঃ মাতা এরূপ স্নেহময়ী ও পুত্রহিতাভিলাষিণী বলিয়া কি শোকে, কি রোগে, কি সুখে, কি দুঃখে, কি সম্পদে, কি বিপদে সকল সময়েই তাঁহার নাম আমাদিগের পক্ষে এত সুখদায়ক বলিয়া বোধ হয়। আর এই কারণেই দেবীগণের আরাধনা সময়ে আমরা সর্ব্বাগ্রে "মা" বলিয়া তাঁহাদের সম্বোধন করি। "মা" বলিয়া সম্বোধন না করিলে সহস্র প্রকারে আরাধনা

* ৺ মহাত্মা রামমোহন রায়ের গানটী স্মরণ করুন :—
"আমায় কোথায় আনিলে * * *
কোথায় রইল পিতা মাতা, কে করে স্নেহ মমতা" ইত্যাদি—

করিয়াও আমাদের তৃপ্তি বোধ হয় না। সত্য সত্যই চাণক্য বলিয়াছেন :—

"মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্য্যাচাপ্রিয়বাদিনী
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহং॥"

"মা" শব্দের এমনি মোহিনী শক্তি, যে "মা" বলিয়া সম্বোধন করিলে স্ত্রীলোক মাত্রেরই হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ স্নেহের সঞ্চার হইয়া থাকে।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, পৃথিবীতে স্বার্থশূন্য হইয়া কেহ কোন কর্ম্ম করে না। নিঃস্বার্থতা নামে কোন পদার্থ পৃথিবীতে নাই, উহা কাল্পনিক কথা মাত্র। তাঁহারা বলিতে পারেন, মাতার স্নেহেও স্বার্থ আছে। সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত, বিদ্বান্ ও কৃতী হইয়া অর্থোপার্জ্জন দ্বারা মাতার সাহায্য করিবে, এই অভিপ্রায়েই তিনি সন্তানকে এত স্নেহ করেন। যাঁহারা এরূপ ভাবেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত ও সঙ্কীর্ণচেতা। জগদীশ্বর লোকসংস্থিতির উদ্দেশে মাতার অন্তঃকরণ নিঃস্বার্থ স্নেহের অক্ষয় ভাণ্ডার স্বরূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। জননী সেই স্নেহের বশীভূত হইয়া নিঃস্বার্থভাবেই সন্তানের প্রতি যত্ন ও মমতা করেন। ভবিষ্যতে সন্তান হইতে উপকার প্রাপ্ত হইব, এরূপ চিন্তা, সন্তান প্রতিপালন সময়ে কখনই তাঁহার মনে স্থান পায় না। মনুষ্যজীবন নলিনীদলগত জলের ন্যায় নিতান্ত ক্ষণ-ভঙ্গুর, মরণের অবধারিত কালও নাই, সুতরাং শিশু যে নিশ্চিতই জীবিত থাকিয়া ভবিষ্যতে তাঁহার সাহায্য করিবে, এরূপ আশা দুরাশা বলিয়া বোধ হয়। জননী কেবল ঈশ্বরদত্ত স্নেহের

অনুরোধেই সন্তানকে পালন করেন, প্রত্যুপকার প্রত্যাশায় নহে। তাঁহার স্নেহে স্বার্থ নাই, তবে যে সন্তান ভবিষ্যতে তাঁহার সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা কেবল কর্ত্তব্যানুরোধে। ঈশ্বর সমস্ত জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা, আহারদাতা, ভয়ত্রাতা ও রক্ষাকর্ত্তা, মনুষ্য এই নিমিত্ত কর্ত্তব্যানুরোধেই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে ও তাঁহার উপাসনা করে। মনুষ্যেরা তাঁহার উপাসনা ও আরাধনা করিবে, ঈশ্বর এরূপ মনে করিয়া মনুষ্যে সৃষ্টি করেন নাই। সুতরাং মনুষ্যের সৃষ্টি ও রক্ষা বিষয়ে ঈশ্বর যেরূপ নিঃস্বার্থ, সন্তানপালন সম্বন্ধে মাতাও তদ্রূপ। পুত্রই উপার্জ্জন করিয়া মাতার সাহায্য করে, কিন্তু কন্যাত সেরূপ করিতে পারে না। তবে কি মাতা কন্যার প্রতি স্নেহ করেন না? কন্যা অবলা ও চিরপরাধীনা বলিয়া মাতা কন্যাকেই পুত্রাপেক্ষা অধিকতর স্নেহ করিয়া থাকেন, ইহা সকলেই অবগত আছেন। তবে মাতৃস্নেহে স্বার্থপরতা কোথায়? আবার উপার্জ্জনাক্ষম, অপটু ও অকর্ম্মা পুত্রের প্রতিই মাতা অধিকতর স্নেহ করিয়া থাকেন। পুত্র মাতৃভক্তিবর্জ্জিত ও পাষণ্ড হইলেও মাতা তাহাকে স্নেহ করিতে পরাংমুখী হন না :—

"কুপুত্রাঃ কুত্রচিৎ সন্তি ন কুত্রচিৎ কুমাতরঃ
কুত্র মাতা পুত্রদোষে তং বিহায় কুগচ্ছতি॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, গণপতি খণ্ড।

"কুপুত্র যদ্যপি হয়
কুমাতা কদাপি নয়॥"

মাতৃস্নেহ যে স্বার্থপরতাশূন্য তাহাতে আর সন্দেহ কি? মাতৃস্নেহ ঐশ্বরিক স্নেহের প্রতিবিম্ব স্বরূপ।

পাঠক মহাশয়! এক্ষণে একবার ভাবিয়া দেখুন, জননী যথার্থ ই "স্বর্গাদপি গরীয়সী" কি না? যিনি আমাদিগকে গর্ভে ধারণ এবং প্রসববেদনারূপ নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, যিনি স্বকীয় শরীরনিঃসৃত অমৃতরস পান করাইয়া আমাদের দেহ পুষ্ট করিয়াছেন, যিনি এতাদৃশ বাৎসল্যাতিশয় সহকারে অশেষবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়া প্রাণপণে আমাদিগের লালন পালন করিয়াছেন, যিনি অলৌকিক নিঃস্বার্থ স্নেহরসের অক্ষয় প্রস্রবণ, যিনি জীবন উৎসর্গ করিয়া কায়মনোবাক্যে আমাদিগের হিতসাধন করেন, যিনি আমাদের সুখে সুখিনী ও দুঃখে দুঃখিনী, সেই পরমারাধ্যা পরম পূজনীয়া স্নেহময়ী জননী যে "স্বর্গাদপি গরীয়সী" তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি মন্দাকিনীর ন্যায় অনবরত সন্তানগণকে সুখসলিল বিতরণ করেন, তাঁহার সুকোমল অন্তঃকরণরূপ নন্দনকাননে স্নেহপারিজাত নিত্যবিকসিত, তিনি কামধেনুর ন্যায় সন্তানের যাবতীয় অভাব বিমোচন করেন, তিনি বাৎসল্য সুধার একমাত্র আধার, তিনি সন্তানের প্রতি হিংসা দ্বেষ ও ক্রোধ বিবর্জ্জিত, তিনি সন্তানের শান্তিনিকেতন এবং দেবদেবীগণের সমষ্টি স্বরূপিণী, অতএব তিনিই স্বর্গ। আবার ইন্দ্রিয়সংযম, ধর্ম্মানুষ্ঠান, কঠোর তপশ্চরণ প্রভৃতি বহুবিধ আয়াসে জীবনান্তে স্বর্গসুখের অধিকারী হইতে পারা যায়, কিন্তু জননীর নিকট সন্তান তপশ্চরণাদি ব্যতিরেকে জীবিতাবস্থাতেই অনায়াসে স্বর্গসুখ অনুভব করে, অতএব জননী "স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

এরূপ স্নেহময়ী ও "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জননীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহার আর বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করিবার আবশ্যকতা নাই। সুশীল, ধর্ম্মপরায়ণ ও কৃতজ্ঞ সন্তান তাহা অনায়াসেই বুঝিয়া লইতে পারিবেন। তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা অকৃত্রিম ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহার অনুগত থাকা, অতি যত্ন সহকারে তাঁহার মনস্তুষ্টি সম্পাদন ও চিত্ত বিনোদন করা এবং সাধ্যানুসারে তাঁহার প্রত্যুপকার করিবার জন্য প্রস্তুত থাকা আমাদের প্রধান ধর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে নরাধমের কঠিন হৃদয়ভূমিতে মাতৃভক্তির বীজ অঙ্কুরিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়, সে পশুপ্রকৃতি, নীচাশয় ও অকৃতজ্ঞ; সেই নরাকার পিশাচের অন্তঃকরণ মরুভূমি সদৃশ ভীষণ এবং সেই পাপাত্মা সহস্র সদ্গুণে অলঙ্কৃত হইলেও মণি-বিভূষিত আশীবিষের ন্যায় সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই মাতৃভক্তি প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জল বায়ু, বিভিন্ন রীতি-নীতি, বিভিন্ন আচার ব্যবহার ও বিভিন্ন ধর্ম্ম। নানা মুনির নানা মত। কিন্তু কোন দেশের কোন লোকই কোন কালে পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তি যে অতি প্রধান ধর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম এ মতের বিরোধী নহেন। মাতৃভক্তি প্রধান ধর্ম্ম এই বাক্য সর্ব্বদেশ প্রচলিত ও সর্ব্ববাদী সম্মত। গুরুজনে ভক্তি করিতে কে কোথায় নিষেধ করে? মাতার সমান গুরু কে আছেন? কৌশল্যা দেবী ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মহামতি মনুর বচনানুসারে বনগমন কালে রামচন্দ্রকে বলিতেছেন :—

"পিতৃন্ দশচ মাতৈকা সর্ব্বাং বা পৃথিবীং বিভো।
গুরুত্বেনাভিভবতি কোঽস্তি মাতৃসমো গুরুঃ॥
পতিতা গুরব স্ত্যাজ্যা মাতা তুন কথঞ্চন।
গর্ভধারণ পোষাভ্যাং নন্নু মাতা গরীয়সী॥"

বাল্মীকি রামায়ণ।

মাতা গৌরবে পিতার দশগুণ, তিনি গৌরবে সমুদায় পৃথিবী-কে পরাভব করিতে পারেন। পিতা অথবা অন্য গুরু ঘৃণার্হ কর্ম্ম করিয়া পতিত হইলে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করা যাইতে পারে, কিন্তু মাতা পতিতা হইলেও কদাপি বর্জ্জনীয়া নহেন; গর্ভধারণ এবং সন্তান পরিপোষণ করেন বলিয়া মাতা মহাগুরু। মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের অন্তর্গত গণপতি খণ্ডের দুইটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"জনকো জন্মদানাচ্চ রক্ষণাচ্চ পিতানৃণাং।
ততো বিস্তীর্ণ করণাৎ কলয়া স প্রজাপতিঃ॥
পিতুঃ শতগুণৈর্ম্মাতা পোষণাদ্গর্ভ ধারণাৎ।
বন্দ্যা পূজ্যা চ মান্যা প্রসূরূপা বসুন্ধরা॥"

জন্মদান করিয়া থাকেন বলিয়া পিতার নাম জনক এবং পালন করেন বলিয়া তাঁহার নাম পিতা; তিনি বংশবিস্তার করেন বলিয়া প্রজাপতি স্বরূপ। কিন্তু পূজনীয়া বসুন্ধরারূপিণী মাতা সন্তানপোষণ এবং গর্ভধারণ করেন বলিয়া পিতা অপেক্ষা শত-গুণে মাননীয়া।

"সর্ব্বতীর্থেভ্যো মাতা গরীয়সী". ইতি শ্রুতিঃ।
মাতা সর্ব্ব তীর্থ অপেক্ষা গরীয়সী।

আবার দেখুন :—

"মাতরং পিতরঞ্চোভৌ দৃষ্ট্বা পুত্রস্তু ধর্ম্মবিৎ।
প্রণম্য মাতরং পশ্চাৎ প্রণমেৎ পিতরং গুরুম্॥

কৌর্ম্ম।

ধর্ম্মজ্ঞ পুত্র মাতা ও পিতা উভয়কে একত্র দর্শন করিলে সর্ব্বাগ্রে মাতাকে প্রণাম করিয়া পশ্চাৎ পিতাকে প্রণাম করিবেন।

সেই পরম গুরু মাতাকে কোন্ পাষণ্ড ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে? বাস্তবিক ঈশ্বরই বল, দেবতাই বল, পিতা মাতাই বল, বা অন্য কেহ বল, উহাঁরা সকলে উপকারক বলিয়াই আমাদের ভক্তিভাজন ও উপাস্য; তাহা না হইলে কে কাহার উপাসনা করে? সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মাতার ন্যায় উপকারিণী আর কে আছেন? মাতা হইতে লোকে যত উপকার প্রাপ্ত হন, তত উপকার আর কাহা হইতেও প্রাপ্ত হন না। ঈশ্বর আমাদের মহোপকারক সত্য, কিন্তু আমাদের উপকার করিতে তাঁহার কিছুমাত্র ক্লেশ হয় না, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং ইচ্ছামাত্রেই উপকার করিতে পারেন, কিন্তু মাতাকে কতই ক্লেশ স্বীকার করিয়া সন্তানের হিতসাধন করিতে হয়। সহজে উপকার করিতে পারা এবং ক্লেশ স্বীকারপূর্ব্বক উপকার করা, এই উভয়ের অনেক অন্তর।

এস্থলে কাশীখণ্ডের একটী বিবরণ না লিখিয়া থাকা যায় না। একদা কার্ত্তিক ও গণেশের মধ্যে কাহার পূজা অগ্রে হইবে, এই

বিষয় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। কার্ত্তিক কহিলেন, আমার পূজা অগ্রে হওয়া আবশ্যক। গণেশ নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে বলিলেন, "না, তাহা হইতে পারে না, আমার পূজা অগ্রে হওয়া উচিত।" এই বিষয় লইয়া যখন ঘোরতর বিবাদ ও বাক্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইল, তখন তাঁহারা দুই জনে বিবাদ মীমাংসার জন্য জনক কৈলাসপতি মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন। মহাদেব কহিলেন, "বৎস! তোমরা স্থির হও, আমি নিষ্পত্তি করিয়া দিতেছি। তোমাদিগকে একটী পণ রাখিতে হইবে। তোমাদের মধ্যে যে কেহ নিরূপিত সময়মধ্যে অগ্রে সমগ্র ভূমণ্ডল প্রদাক্ষণ করিয়া আসিতে পারিবে, তাহারই পূজা অগ্রে হইবে।" বলদৃপ্ত দেবসেনানী কার্ত্তিকেয় এই কথা শ্রবণ মাত্র আর ক্ষণকাল বিলম্ব করিলেন না। দ্রুতগামী ময়ূরবাহনে আরোহণপূর্ব্বক ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতে বহির্গত হইলেন। গণেশ মহাবিপদে পড়িলেন; তিনি লম্বোদর মূষিকবাহন, দ্রুত গমনে অশক্ত। ভাবিয়া চিন্তিয়া জননী পার্ব্বতী দেবীকে সাত-বার প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিলেন। নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বেই কার্ত্তিকেয় ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণকার্য্য সমাধা করিয়া প্রত্যাগত হইলে, দেবাধিদেব ভবানীপতি কহি-লেন, "বৎস কার্ত্তিকেয়! তুমি সমগ্র ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়াছ, গণেশ তাহা পারেন নাই, যথার্থ বটে; কিন্তু গণেশ স্বীয় জননীকে সাত বার প্রদক্ষিণ করিয়াছে। জননী সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষা গরীয়সী; অতএব তুমি পণে হারিয়াছ, গণেশের পূজাই

অগ্রে হইবে।" তদবধি সর্ব্বাগ্রে গণেশের পূজা চলিয়া আসিতেছে।

তন্ত্র শাস্ত্রে লিখিত আছে মন্ত্রদাতা গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে যে ফললাভ হয়, মাতার নিকট দীক্ষিত হইলে, তাহার অষ্টগুণ অধিক ফললাভ হইয়া থাকে। মাতৃ শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ, যাঁহাকে সম্মান ও পূজা করিতে হয়, মান্যতে পূজ্যতে যা সা, মানঙ্ পূজায়াং, মান ধাতুর নাম অর্থে ডাতৃ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ।

"মা" এটী প্রথম উচ্চারিত শব্দ ও স্বয়ং উদ্ভূত। স্বয়ং ঈশ্বর ইহার শিক্ষাদাতা। শিশু গর্ব্ভবাস হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পরক্ষণেই "মা" শব্দ উচ্চারণ করিয়া রোদন করিতে থাকে, কিন্তু তৎকালে জিহ্বার জড়তা প্রযুক্ত তাহা সুস্পষ্ট উপলব্ধ হয় না। পরে বয়োবৃদ্ধি সহকারে শিশু বেদের প্রণবের ন্যায় সর্ব্বাগ্রে সুস্পষ্ট "মা" শব্দ উচ্চারণ করিয়া অন্যান্য কথা কহিতে শিখে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন কথা প্রয়োজিত হয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় "মা" শব্দটী সকল ভাষাতেই প্রচলিত। কি সংস্কৃত, কি ইংরাজী, কি ফরাসী, কি গ্রীক্, কি লাটিন্, কি আরবীয়, কি পারসী কি চীন্ সকল ভাষাতেই "মা" শব্দ সমভাবে বিরাজমান থাকিয়া মাতার গুরুত্ব সপ্রমাণ করিতেছে। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে জননী, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণী, রাজপত্নী, গাভী, ধাত্রী, ও পৃথিবী এই সপ্তমাতা। ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, ঐন্দ্রী, বারাহী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, চামুণ্ডা ও চর্চ্চিকা ইহাঁরা অষ্ট মাতৃকা এবং গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা,

সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, আত্মদেবতা ও কুলদেবতা ইহাঁরাও ষোড়শ মাতৃকা। ইহাঁরা সকলেই আমাদের অশেষ উপকারিণী বলিয়া মাতৃপদ বাচ্যা ও পূজনীয়া। কিন্তু একমাত্র গর্ব্ভধারিণী জননী ইহাঁদের সকলের সমষ্টিভূতা, সর্ব্বাপেক্ষা হিতকারিণী সুতরাং অতীব মান্যা ও পূজ্যা। সেই পরম গুরু পূজনীয়া মাতাকে কোন্ পাষণ্ড ভক্তি না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে? আমাদের প্রকৃতিই এইরূপ, যাহা হইতে আমরা কোনপ্রকার মানসিক অথবা শারীরিক ক্লেশ প্রাপ্ত হই, তাহার প্রতি আমাদের শত্রুতা ভাব আসিয়া পড়ে। জননী পুত্রের উৎপাদন ও পালন বিষয়ে কতই ক্লেশ প্রাপ্ত হন, কিন্তু পুত্রের প্রতি তাঁহার শত্রুতাভাবের কথা দূরে থাকুক, পুত্রের প্রতি তিনি যেরূপ স্নেহবতী, এমন আর কেহই নয়। গর্ব্ভধারণ, লালন পালন ও আমাদের হিতসাধন করিবার জন্য জননী যে সকল বিজাতীয় ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলে তাহার আংশিক পরিশোধ হয় মাত্র। কস্মিন্‌কালে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার নিকট আনৃণ্যলাভ করিতে পারা যায় না। মনুর বচন স্মরণ করুন:—

"যং মাতা পিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাম্।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি॥"

অপত্যজননে পিতা মাতা যে ক্লেশ সহ্য করেন, পুত্র শত শত বৎসরে শত শত জন্মেও তাহা পরিশোধ করিতে সমর্থ হয় না। যাঁহার কটাক্ষে সৃষ্টিস্থিতিলয় হয়, সেই গোলোকবিহারী

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মাতৃঋণের নিমিত্ত মাতৃহস্তে বন্ধন স্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

"সর্ব্বার্থসম্ভবো দেহো জনিতঃ পোষিতো যতঃ।
ন তয়ো র্যাতি নির্বেশং পিত্রোর্মর্ত্ত্যঃ শতায়ুষা॥"

শ্রীমদ্ভাগবত।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, জননীর প্রতি ভক্তি প্রকাশ, করা হয়? হৃদয়মন্দিরে তাঁহার স্নেহার্দ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রত্যক্ষ উপাস্য দেবীর ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহার স্মরণ করা উচিত। সংসারের নানা [illegible] ব্যস্ত থাকিয়াও সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি মনোযোগ রাখ [illegible] যেমন উত্তুঙ্গ গিরিবরের মধ্যদেশ মেঘমালা ও তুহিন [illegible] পরিবেষ্টিত থাকিলেও উহার অভ্রভেদী শিখরদে[illegible] রশ্মিতে আলোকিত থাকে, সেইরূপ জটিল সাংসারিক কা[illegible]রূপ জলদজাল ও চিন্তাতুষারমালা অতিক্রম করিয়াও [illegible] জননীর প্রতি শ্রদ্ধারূপ উজ্জ্বল রবিকর আমাদের মানসশৈলে[illegible] সর্ব্বোচ্চভাগ উদ্ভাসিত করিয়া রাখে। নিতান্ত অনুগত বিশ্বস্ত ভৃত্যের ন্যায় প্রফুল্লচিত্তে সতত তাঁহার আজ্ঞাপালন করা উচিত, কোনক্রমেই তাঁহার আজ্ঞায় অবহেলা করা এবং তাঁহার অবাধ্য হওয়া উচিত নহে। যদি তিনি কখন অন্যায় আজ্ঞা করেন, তবে ধীরে ধীরে নম্রভাবে তাঁহার আজ্ঞার অন্যায্যতা বুঝাইয়া দিয়া সেই অন্যায় আজ্ঞা প্রদান হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করা উচিত; তাহাতেও যদি তিনি, ক্ষান্ত না হন, তবে তাঁহার অন্যায় আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া লোকের নিন্দার্হ হওয়াও ভাল, তথাপি

তাঁহার আজ্ঞাপালনে বিমুখ হইয়া এবং তাঁহার অবাধ্যতাচরণ করিয়া আত্মাকে দুরপনেয় পাপপঙ্কে লিপ্ত করা উচিত নহে। মাতৃআজ্ঞায় সকল কর্ম্মই করা যাইতে পারে। মহাত্মা পাণ্ডবগণ মাতার আজ্ঞাক্রমে পঞ্চ ভ্রাতায় মিলিয়া একটী স্ত্রীকে বিবাহ করেন, তাঁহার আজ্ঞার প্রতিকূলতাচরণ করিতে সাহসী হন নাই। মহাভারত গ্রন্থে শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্বাধ্যায়ে মহামতি ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিতেছেন :—

" যচ্চতেঽভ্যজানীয়ুঃ কর্ম্ম তাত সুপূজিতাঃ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিরুদ্ধং বা তৎকর্ত্তব্যং যুধিষ্ঠির ॥"

হে তাত ! পরম পূজনীয় পিতা মাতা ও গুরুদেব যে কর্ম্মে অনুমতি প্রদান করেন, ধর্ম্ম বিরুদ্ধই হউক বা ধর্ম্মানুগতই হউক, তাহা কর্ত্তব্য।

জননী সর্ব্বদা যাহাতে প্রীত, প্রফুল্ল ও সচ্ছন্দ থাকেন, তাহার উপায় করা নিতান্ত আবশ্যক। পরুষ বচন প্রয়োগ করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে বেদনা দেওয়া নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম। যিনি স্নেহের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ, নিরাশ্রয় বাল্যকালে যাঁহার স্নেহে বঞ্চিত হইলে কোন্ দিন আমাদের নাম ধরাতল হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইত, আমাদের পদতলে একটী সামান্য কণ্টক বিদ্ধ হইলে, যাঁহার হৃদয়ে শেলাঘাতের ক্লেশ অনুভূত হইত, সেই জননীকে বাক্যশেলে বিদ্ধ করিয়া যন্ত্রণা প্রদান করা কতদূর পাষণ্ডের কার্য্য। যদিও তিনি কলহপ্রিয়া, কর্কশস্বভাবা অথবা কটুভাষিণী হন, তথাপি তাঁহার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ অথবা

তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করা সন্তানের নিতান্ত বিসদৃশ কার্য্য।' মনুসংহিতায় লিখিত আছে :—

" আচার্য্যশ্চ পিতাচৈব মাতা ভ্রাতাচ পূর্ব্বজঃ।
নার্ত্তেনাপ্যবমন্তব্যা ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ ॥"

অচার্য্য, পিতা, মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক পীড়িত হইলেও ইহাঁদিগের অবমাননা কদাচ করিবে না। জননীর কটুবাক্য আশীর্ব্বাদ মনে করিয়া সতত নম্রভাবে ধীরে ধীরে তাঁহার সহিত কথা কহা উচিত। মাতার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা দূরে থাকুক, কথন তাঁহার সহিত উচ্চস্বরে কথা কহিতে নাই। জগদ্বিখ্যাত বীর ম্যাসিডনের অধিপতি মহাত্মা আলেক্জাণ্ডারের মাতা ওলিম্পিয়া অতিশয় কলহপ্রিয়া ও কটুভাষিণী ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই অন্যায়াচরণ দ্বারা স্বীয় পুত্রকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন, কিন্তু আলেক্জাণ্ডার যেমন মহাবীর ছিলেন আবার তেমনই মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া জগৎ মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। জননীর নিতান্ত অসুখজনক আচরণেও তিনি কথন বিরক্তি অনুভব করেন নাই। আলেক্জাণ্ডার এণ্টিপেটরের হস্তে রাজ্যশাসনের ভার সমর্পণ পূর্ব্বক দিগ্বিজয়ে যাত্রা করেন। ওলিম্পিয়া রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ, কটুভাষাপ্রয়োগ প্রভৃতি অন্যা-য়াচরণ দ্বারা এণ্টিপেটরকে এরূপ বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, যে তিনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া ওলিম্পিয়ার অন্যায়াচরণের উল্লেখপূর্ব্বক পত্রদ্বারা আলেক্জাণ্ডারের নিকট অভিযোগ করিয়া পাঠান। তদুত্তরে আলেক্জাণ্ডার লিখিয়াছিলেন :—

•"এণ্টিপেটর্! তুমি জান না, আমার জননীর একমাত্র অশ্রুবিন্দু তোমার শত শত পত্র বিলুপ্ত করিতে পারে।"

যদি জননী পুত্রের ঈপ্সিত বস্তুদানে অথবা তাহার অভিলাষ পরিপূরণে অসম্মতা হন, অথবা কোন কারণে তিরস্কার কিম্বা শাসন করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি মনে মনেও অসন্তুষ্ট হওয়া পুত্রের উচিত নয়। আমাদের মঙ্গলের জন্যই তিনি এরূপ করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। যখন কেহ অনুমাত্র উপকার করিলেও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকা আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তখন আমাদের অশেষ কল্যাণকারিণী জননীর নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকা যে আমাদের জীবনের সর্ব্বপ্রধান ব্রত তাহাতে আর সন্দেহ কি? কৃতজ্ঞতাপূর্ণহৃদয়ে তাঁহার নিকট হৃদয়কবাট উদ্ঘাটন করিয়া রাখিবে, কদাচ তাঁহার সহিত কপটাচরণ করিবে না; বাহ্যভক্তি প্রদর্শন করিয়া হৃদয়ের গুপ্ততম প্রদেশেও অবজ্ঞা ও অনাস্থাকে স্থানদান করিবে না, সেরূপ কর্ম্ম কদাচ মার্জ্জনীয় নহে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তক বাইবেলে লিখিত আছে :—

"Cursed be he that setteth light by his father or his mother." "The eye that mocketh at his father, the ravens of the valley shall pluck it out, and the young ravens shall eat it."

যে পিতা মাতাকে অবজ্ঞা করে, সে পরমেশ্বরের কোপে পতিত হয়। যে তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে,

উপত্যকাস্থিত বায়সগণ তাহার চক্ষুরুৎপাটন করে এবং বায়স শাবকেরা সেই চক্ষু ভোজন করে।

যদি দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ জননী পীড়িতা হন, তবে প্রাণপণে তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হওয়া সন্তানের প্রধান ধর্ম্ম। স্বার্থপরের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকা নরাধমের কার্য্য। সন্তানের পীড়া হইলে মাতা কি না করিয়া থাকেন? প্রাণান্ত করিয়াও তাহার রোগোপশমের চেষ্টা করেন। এরূপ জননীর পীড়ার সময়ে সেবাশুশ্রূষা ও চিকিৎসায় যে দুরাত্মা ঔদাসীন্য প্রকাশ করে, নরকেও তাহার স্থান নাই। বৃদ্ধাবস্থায় যখন তিনি সামর্থ্যহীন হইয়া পড়েন, তখন অন্ধের যষ্টির ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহার সাহায্য করা এবং ক্লেশ নিবারণ ও সুখ সম্পাদনের উপায় বিধান করা প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সারস পক্ষী কত যত্নে বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা করিয়া থাকে। ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবশ্রেষ্ঠ মানব যে বৃদ্ধ পিতামাতার সেবাশুশ্রূষায় বিমুখ থাকিবে ইহা বড় লজ্জা ও পাপের কথা। এরূপ সন্তানের ন্যায় পাপিষ্ঠ ও নরাধম পৃথিবীতে আর নাই। বসুমতী ইহাদের পাপভার বহনে অসমর্থা হইয়াই যেন ভূমিকম্পচ্ছলে মধ্যে মধ্যে কম্পিতা হইয়া থাকেন। ফলতঃ মৃত্যুকালে আমি কুলপ্রদীপ সন্তানের গর্ব্ভধারিণী ছিলাম, এই ভাবিয়া তিনি যেন প্রফুল্লহৃদয়ে দেহত্যাগ করেন, কুলের কণ্টক অধম সন্তান রাখিয়া যাইতে হইল মনে করিয়া ভগ্নান্তঃকরণে তাঁহাকে যেন ইহলোক পরিত্যাগ করিতে না হয়।

হিন্দুসন্তান যে কেবল পিতা মাতার জীবদ্দশাতেই তাঁহাদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য, এরূপ নহে। পিতা মাতার পারলৌকিক সদ্গতি লাভের জন্য ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে চিরজীবন তাঁহাদের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি কার্য্যে রত থাকা হিন্দু সন্তানের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। "পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনম্" সকল পুত্রেরই হৃদয়ে এই বাক্যটী জাগরুক থাকা উচিত। শ্রাদ্ধদ্বারা দুইটী মহান্ উদ্দেশ্য সাধিত হয়। স্বর্গারূঢ় ৺ পিতামাতার পারলৌকিক সুখসম্পাদন শাস্ত্রানুসারে ত হইয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত শ্রাদ্ধ কালে মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের নাম কীর্ত্তিত হওয়াতে তাঁহারা বিস্মৃতির অন্ধকারময় কূপে নিমজ্জিত হইতে পারেন না। বোধহয় ইহারই নাম "পুৎ"নরক; আর এই বীভৎস নরক হইতে ত্রাণ পাইবার জন্যই বোধ হয় লোকের পুত্রলাভ বাসনা এত দূর বলবতী। বাস্তবিক মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যে মর্ত্ত্যলোক হইতে নামটী পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, কেহই এরূপ ইচ্ছা করে না। ইংলণ্ডদেশের সুপ্রসিদ্ধ কবি গ্রে (Grey) লিখিয়া গিয়াছেন :—

"For who to dumb forgetfulness a prey
This pleasing anxious being e'er resigned?"

মৃত্যুর পর চিরকাল না হউক, অন্ততঃ কিছুকাল পৃথিবীতে স্বনাম কীর্ত্তিত হয়, এ বাসনা সকলেরই হৃদয়ে বলবতী। পুত্রকৃত শ্রাদ্ধদ্বারা অনায়াসে সেই মহান্ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। স্বর্গারূঢ় পিতা মাতার উদ্দেশে সুমহৎ কীর্ত্তিস্থাপন দ্বারাও তাঁহাদের নাম চিরস্মরণীয় করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু সেরূপ

কীর্ত্তিস্থাপনের সুযোগ সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ন্যায় স্বর্গীয় মাতাঠাকুরাণীর নামে কয়জন widow fund স্থাপন করিতে পারেন? অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে ৺ পিতা মাতার মৃত্যুদিনে দানাদি করা এবং কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাদের নাম স্মরণ করা সন্তানের অতিশয় কর্ত্তব্য। ফলতঃ পিতৃশ্রাদ্ধ ও মাতৃশ্রাদ্ধ হিন্দুজাতির একটী অতি সুনিয়ম। হিন্দুসন্তান সেই সুনিয়ম প্রতিপালনে একান্ত বাধ্য। দুঃখের বিষয়, এদেশীয় পাশ্চাত্য সভ্যতালোকসম্পন্ন আধুনিক নব্যসম্প্রদায় এই সুনিয়ম প্রতিপালনে শিথিলযত্ন হইয়া পড়িতেছেন।

আমাদের দেশে একটী সংস্কৃত বচন প্রচলিত আছে :—

"এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ।
যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ॥"

অনেক পুত্রলাভের অভিলাষ করিবে, কারণ তাহাদের মধ্যে যদি একজনও গয়াশ্রাদ্ধ করে, অশ্বমেধ যজ্ঞ করে অথবা নীলবৃষ উৎসর্গ করে। এই বচনটী মৎস্য পুরাণের; উহা স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তাঁহার প্রণীত শুদ্ধিতত্ত্বে উদ্ধৃত করিয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্র মতে গয়া শ্রাদ্ধে বিশেষ ফল দৃষ্ট হয়। পুণ্যক্ষেত্র গয়াধামে ৺ গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ড সমর্পণ করিলে ৺ পিতৃলোকের মোক্ষ লাভ হয়।

"দত্বা বিষ্ণুপদে পিণ্ডং বিষ্ণুং যশ্চ প্রপূজয়েৎ।
পিতৃণাং স্বাত্মন শ্চৈব করোতি জন্ম খণ্ডনং॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

অতএব গয়া শ্রাদ্ধ হিন্দুসন্তান মাত্রেরই কর্ত্তব্য। বাস্তবিক গয়াধামে মাতৃপিণ্ডদানের মন্ত্রগুলি অতি সুন্দর। ঐ মন্ত্রগুলি অশেষ কল্যাণকারিণী মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উত্তম প্রযোজক। সর্ব্বশুদ্ধ (১৬টী) ষোলটী মন্ত্র আছে, এজন্য উহা-দিগকে মাতৃষোড়শী বলে। মন্ত্রগুলি এবং তাহাদের বাঙ্গালা ভাবার্থ নিম্নে প্রকটিত হইল। মন্ত্র গুলি এত সুন্দর যে, সে গুলি পাঠ করিতে করিতে অশ্রু সংবরণ করা যায় না।—

১। "গর্ত্তাদবগমে চৈব বিষমে ভূমিবর্ত্মনি।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্॥"

গর্ত্তাবাস হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার সময় যে জননী অতি বিষম ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত আমি এই পিণ্ড প্রদান করিতেছি।

২। "মাসি মাসি কৃতং কষ্টং বেদনা [illegible]
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপি[illegible]॥"

যে জননী আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়া [illegible] কতপ্রকার ক্লেশ অনুভব করিয়াছেন এবং প্রসব [illegible] ত সীমা ছিলনা, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত [illegible] প্রদান করিতেছি।

৩। "শৈথিল্যে প্রসবে চৈব [illegible]।
তস্যা ইত্যাদি॥"

গর্ত্তধারণ করিয়া অঙ্গের শৈথিল্য [illegible] প্রসবকালের ক্লেশ বশতঃ যে জননীর দুঃসহ যন্ত্রণা উ[illegible]য়াছিল, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত ইত্যাদি।

৪। "পস্ত্যাং জনয়তে মাতুর্দুঃখঞ্চৈব সুদুস্তরং।
তস্যা ইত্যাদি॥"

(পস্ত্যাং ইত্যত্র দোর্ভ্যাং ইতি চ পাঠঃ)

গর্ভবাস কালে পদদ্বয় ও হস্তদ্বয় বিক্ষেপ করাতে যে জননীর দুস্তর ক্লেশ হইয়াছিল, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত ইত্যাদি।

৫। "অগ্নিনা শোষতে দেহং ত্রিরাত্রানশনেষুচ।
তস্যা ইত্যাদি॥"

প্রসবান্তে অগ্নিতাপ গ্রহণে যে জননীর দেহ শুষ্ক হইয়াছিল এবং তিন দিন অনশনে যাঁহার বিষম ক্লেশ হইয়াছিল, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত ইত্যাদি।

৬। "পিবেচ্চকদ্রব্যানি ক্লেশানি বিবিধানিচ।
তস্যা ইত্যাদি॥"

প্রসবান্তে কটু তিক্ত কুৎসিত দ্রব্য আহারে যে জননীর বিবিধ ক্লেশ হইয়াছিল, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত ইত্যাদি।

৭। "দুর্লভং ভক্ষ্যদ্রব্যস্য ত্যাগে বিন্দতি যৎফলং।
তস্যা ইত্যাদি॥"

যে জননী সন্তানের জন্য উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্য ত্যাগ করিয়া কষ্ট অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত ইত্যাদি।

৮। "রাত্রৌ মূত্র পুরীষাভ্যাং ভিদ্যতে মাতৃকর্পটং।
তস্যা ইত্যাদি॥"

রাত্রিতে মলমূত্র দ্বারা যে জননীর জীর্ণ ও মলিন বস্ত্র ভিজাইয়া দিয়াছি, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত ইত্যাদি।

৯। "পুত্রং ব্যাধি সমাযুক্তং মাতৃদুঃখমহর্নিশং।
তস্যা ইত্যাদি॥"

পুত্র ব্যাধিযুক্ত হইলে যে জননী অহর্নিশ দুঃখ অনুভব করিয়াছিলেন, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত ইত্যাদি।

১০। "যদা পুত্রং ন লভতে তদা মাতুশ্চ শোচনং।
তস্যা ইত্যাদি॥"

যদবধি জননী পুত্রলাভ করিতে পারেন নাই, সেই অবধি যে জননী নিরন্তর দুঃখিতমনে কালযাপন করিয়াছেন, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত ইত্যাদি।

১১। "ক্ষুধয়া বিহ্বলে পুত্রে দদাতি নির্ভয়ং স্তনং।
তস্যা ইত্যাদি॥"

পুত্র ক্ষুধায় কাতর হইলে, যে জননী সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অতিশয়িতরূপে স্তন্যদান করেন, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত ইত্যাদি।

১২। "দিবা রাত্রৌ যদা মাতুঃ শোষণঞ্চ পুনঃ পুনঃ।
তস্যা ইত্যাদি॥"

সন্তান পালন সময়ে রাত্রি দিন যে জননীর স্নানাভাব, উৎকৃষ্ট আহারাভাব এবং স্তন্যদান বশতঃ শরীর শুষ্ক হইতে থাকে, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত ইত্যাদি।

১৩। "পূর্ণেতু দশমে মাসি মাতুরত্যন্ত দুষ্করং।
তস্যা ইত্যাদি॥"

দশম মাস পূর্ণ হইলে যে মাতার আর ক্লেশের সীমা থাকে না, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত ইত্যাদি।

১৪। "গাত্রভঙ্গো ভবেন্মাতু স্তৃপ্তিং নৈব প্রযচ্ছতি।
তস্যা ইত্যাদি ॥"

দশম মাস পূর্ণ হইলে যে জননীর গাত্রভঙ্গ অর্থাৎ গাত্রের অবসন্নতা উপস্থিত হইয়া কোন বিষয়েই তাঁহাকে সন্তোষ লাভ করিতে দেয় না, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত ইত্যাদি।

১৫। "অল্পাহারবতী মাতা যাবৎ পুত্রোঽস্তি বালকঃ।
তস্যা ইত্যাদি ॥"

পুত্র যে পর্য্যন্ত বালক থাকে সে পর্য্যন্ত যে জননী পুত্রের পীড়া জন্মিবার ভয়ে অল্প আহার করিয়া থাকেন, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত ইত্যাদি।

১৬। "যমদ্বারে মহাঘোরে পথি মাতুশ্চ শোচনং।
তস্যা ইত্যাদি ॥"

পুত্রের মৃত্যু হইলে বা কোন সঙ্কট পথে গমন করিলে যে মাতা নিরন্তর শোক করিয়া থাকেন, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত ইত্যাদি।

মাতৃভক্তিতে সুখও বিস্তর। মাতার প্রতি ভক্তি করিলে সুমহৎ কর্ত্তব্যানুষ্ঠানজনিত সুপবিত্র আত্মপ্রসাদের অধিকারী হইতে পারা যায়। ঐ সুখের সহিত তুলনা করিলে সর্ব্বপ্রকার ঐহিক সুখ তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। মাতা প্রসন্না হইলে দেবতারাও প্রসন্ন হন, সুতরাং সন্তানের সর্ব্বপ্রকার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ এবং ধর্ম্মলাভ হয় :—

"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমংতপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ ॥" *

* এস্থলে পিতা শব্দে পিতা মাতা উভয়কেই বুঝাইতেছে।

লোকে মাতৃভক্ত সন্তানের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে থাকে, তাহার যশঃকুসুমের মনোহর সুগন্ধ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া দিগন্ত পর্য্যন্ত আমোদিত করে এবং সে ঈশ্বরানুগ্রহে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া মনের সুখে সংসারযাত্রানির্ব্বাহ করিতে থাকে। মাতৃভক্তলোক প্রায়ই ক্লেশ পায় না এবং পৃথিবীতে উন্নতি লাভ করে। মাতার প্রতি ভক্তি করিলে মনুষ্য দীর্ঘজীবী ও ব্যাধিহীন হয়। বাস্তবিক যক্ষ্মা প্রভৃতি উৎকট রোগে অনেক চিকিৎসক রোগীকে মাতার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি করিতে বলেন। মাতার প্রতি ভক্তি করিয়া এবং মাতার চরণামৃত পান করিয়া অনেককে উৎকট রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে দেখা গিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন হিন্দুগণ পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তির আদর্শ স্থল। ইহাঁদের পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তির কথা চিরকাল জগতে ঘোষিত হইবে। যতদিন চন্দ্রসূর্য্য কক্ষপথে বিচরণ করিবেন, যতদিন রামায়ণ ও মহাভারতের নাম পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত না হইবে, ততদিন হিন্দুগণের অসাধারণ পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তির কথা কেহ বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। হিন্দুজাতি এককালে সভ্যতা ও উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়া ছিলেন। বোধ হয় পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তিই ইহার অন্যতম কারণ। বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, ভারতবর্ষের সেই হিন্দুজাতিই এক্ষণে দুর্দ্দশার নিম্নতম গহ্বরে পতিত !!! পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তির হ্রাস যে সেই অবনতির একটী প্রবল কারণ তাহার সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করিতে যাইয়া আমাদের ধর্ম্মবন্ধনের শৈথিল্যানুরূপ পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তির অল্পতা হইয়া পড়িয়াছে,

সুতরাং তাহার সুনিশ্চিত প্রতিফল স্বরূপ আমরা ক্রমে ক্রমে হীনবল, অল্পায়ু: এবং দীনভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছি, আমাদের পূর্ব্বতন উন্নতির কথা এক্ষণে কাল্পনিক উপন্যাস অথবা নিশার স্বপ্নের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে !!!

ম্যাসিডনের সুপ্রসিদ্ধ বীর মহাত্মা আলেক্‌জাণ্ডারের মাতৃভক্তির কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। যিনি স্বীয় প্রতিভা ও অধ্যবসায় বলে সামান্য অবস্থা হইতে সভ্যতালোকপূর্ণ ফ্রান্সের রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ছিলেন, যাঁহার বীরদর্পে সমগ্র ইউরোপখণ্ড কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল, ইউরোপীয় রাজগণ অসংখ্যসৈন্যপরিবৃত, সুরক্ষিত সুরম্য প্রাসাদ মধ্যে মনোহর পর্য্যাঙ্কস্থিত দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় শায়িত এবং অসংখ্যদাসদাসী কর্ত্তৃক সেব্যমান হইয়া ও যাঁহার বীর্য্যপ্রভাবে সুষুপ্তিসুখ অনুভব করিতে পারেন নাই, সেই বীরাগ্রগণ্য নেপোলিয়ন্ বোনাপার্ট সমধিক মাতৃভক্তিপরায়ণ ছিলেন। আমেরিকার সাধারণতন্ত্রের প্রবর্ত্তয়িতা বীরশ্রেষ্ঠ জর্জ্জওয়াসিংটন্ও অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। এনাপিয়স্ ও এম্ফিনোমস্ নামক দুই যুবকের মাতৃভক্তির বিষয় সকলেই অবগত আছেন। সিসিলি দ্বীপে এটনা নামক আগ্নেয়গিরির ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত সময়ে যখন পার্শ্ববর্ত্তী লোকসমূহ স্ব স্ব ধন ও প্রাণরক্ষায় ব্যস্ত সমস্ত, তখন এই দুই যুবক ধন সম্পত্তি ও জীবন তুচ্ছজ্ঞান করিয়া বৃদ্ধ পিতা মাতাকে স্কন্ধদেশে স্থাপন পূর্ব্বক তথা হইতে চলিয়া যান। দৈবানুগ্রহে ঐ দুই যুবকের এবং তাঁহাদের জনক জননীর জীবন রক্ষা পাইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ দুই যুবক যে পথ দিয়া

গমন করিয়া ছিলেন, অগ্নি সে দিক স্পর্শও করেন নাই, তদবধি ঐ স্থান ধর্ম্মক্ষেত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ধন্য এনাপিয়স্ ও এম্ফিনোমস্ !!! তোমাদের নাম পৃথিবী হইতে কখনই বিলুপ্ত হইবে না।

সুপ্রসিদ্ধ রোমক বীর কোরাইওলেনসের মাতৃভক্তির বিষয় স্মৃতিপথারূঢ় হইলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কোরাইওলেনস্ মহাবীর ছিলেন, তিনি স্বীয় ভুজবীর্য্যপ্রভাবে রোমরাজ্যের সমধিক গৌরববৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে কোন কারণে কোরাইওলেনস্ অব্যবস্থিতচিত্ত রোমকগণের বিরাগ-ভাজন হইয়া দেশনির্ব্বাসন রূপ দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হন। কোরাইও-লেনস্ মর্ম্মাহত হইয়া বৈরনির্য্যাতনোদ্দেশে রোমকগণের চিরশত্রু ভলসীয় জাতির সহিত মিলিত হইলেন। কোরাইওলেনস্ এইরূপে ভলসীয়গণের সেনাপতি হইয়া রোম নগরের উচ্ছেদ সাধন বাসনায় অগণ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে অগ্রসর হইয়া রোমের অতি সন্নিকটে শিবিরস্থাপন করিলেন। রোমকগণ কোরাইও-লেনসের গতিরোধ অভিপ্রায়ে অনেক সৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু বায়ুবেগে যেরূপ তুলারাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, রোমক সৈন্যগণও তদ্রূপ কোরাইওলেনসের বীর্য্যপ্রভাবে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। অবশেষে রোমক কর্ত্তৃপক্ষগণ রোমনগর রক্ষায় সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া কোরাইওলেনসের মাতা ভিতুরিয়ার শরণাপন্ন হইলেন। ভিতুরিয়া কোরাইওলেনস্‌কে রোমনগর আক্রমণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করাইবার অভিপ্রায়ে পুত্রবধূ সমভি-ব্যাহারে পুত্রের শিবিরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। প্রথমে

কোরাইওলেনসের পত্নী স্বামী সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া রোমরক্ষার জন্য অনেক বিনীতি করিলেন, কিন্তু কোরাইওলেনস্ অচল, অটল; তিনি কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না। কিন্তু যখন জননী আসিয়া তাঁহাকে কাতরবচনে অনুরোধ করিলেন, তখন কোরাইওলেনসের বীরহৃদয়ও দ্রবীভূত হইল; তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, গদ্গদস্বরে কহিয়া উঠিলেন "মা! তোমার অনুরোধে আজ রোম রক্ষা পাইল, কিন্তু তুমি কোরাই-ওলেনস্কে হারাইলে; ভলসীয়গণ এখনি আমার প্রাণবধ করিবে।" সৌভাগ্যক্রমে কোরাইওলেনসের কোন অনিষ্ট ঘটে নাই। তাঁহার অসাধারণ মাতৃভক্তি দেখিয়া ভলসীয়গণের কঠিন হৃদয়ও আর্দ্র হইয়াছিল, তাহারা কোরাইওলেনস্কে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিল।

সাক্ষাৎ রুদ্রদেবের অবতার স্বরূপ, নষ্টপ্রায় হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধারকারী যোগীবর মহামতি শঙ্করাচার্য্য অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াও তিনি মাতাকে বিস্মৃত হইয়া যান নাই। মধ্যে মধ্যে আসিয়া মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। মাতার অন্তিমকালে ইনি তাঁহার যথেষ্ট সেবা করিয়াছিলেন এবং অবশেষে স্বকীয় কঠোর তপশ্চরণের ফল দান করিয়া ইনি মাতাকে তৎপ্রার্থিত বিষ্ণুলোকে প্রেরণ করেন। ইহা কি সামান্য মাতৃভক্তির কর্ম্ম !!!

যিনি মহারাষ্ট্রীয়গণের জাতীয় জীবন প্রদান করিয়া ছিলেন, যাঁহার হৃদয়কুণ্ড হইতে বিক্ষিপ্ত প্রদীপ্ত শৌর্য্যবহ্নি ভীষণ মহারাষ্ট্রীয় দাবানল সমুৎপাদন করিয়া দিল্লীর মোগল সিংহাসন

পর্য্যন্ত ভস্মীভূতপ্রায় করিয়া তুলিয়াছিল, সেই শূরশেখর শিবজী ও মাতৃভক্তির জ্বলন্ত উদাহরণ। মহাত্মা শিবজী স্বীয় জননীকে প্রত্যক্ষ দেবীর ন্যায় ভক্তি করিতেন। মাতাকে সভক্তিক প্রণাম ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণান্তে যুদ্ধযাত্রা অথবা অন্যত্র গমন করিতেন এবং যুদ্ধকালে স্নেহময়ী মাতার নাম গ্রহণ ও স্মরণ করিয়া অনেক সময়ে ঘোরতর বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করেন। বঙ্গদেশে স্বর্গীয় মহাত্মা ৺ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, ৺ রাম-গোপাল ঘোষ মহাশয়, হাইকোর্টের অন্যতম জজ্ মহামান্য শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, সার্ মহারাজা বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে, সি, এস্ আই এবং ব্যারিষ্টার্ মিষ্টার্ উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহাঁরাও মাতৃভক্তির জন্য প্রসিদ্ধ। মান্যবর ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয় পদে পদে মাতৃভক্তির সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। মাতার অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়াই ইনি অশেষ পরিশ্রম সহকারে শাস্ত্রজলধি মন্থন করিয়া হতভাগ্য বিধবাগণের দুঃখ বিমোচনের নিমিত্ত “ বিধবা বিবাহ ” গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং বিধবা বিবাহ দেশমধ্যে প্রচলিত করাইবার জন্য প্রভূত অর্থব্যয় ও দুঃসহ ক্লেশ পরম্পরা অম্লান বদনে সহ্য করেন। মহামতি শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অসাধারণ মাতৃভক্তিপরায়ণ। জননীর জলযোগ না হইলে, ইনি আহার করিতেন না এবং কি বিষয়কর্ম্ম, কি অন্যান্য কর্ম্ম, সকল বিষয়েই মাতার অনুমতি গ্রহণ এবং তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন। ইনি যেমনি বিদ্বান্, তেমনি ধর্ম্মনিষ্ঠ, আবার তেমনি মাতৃভক্ত। মাতৃভক্ত বলিয়া পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণ

ইহজগতে কেমন উন্নতি ও খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এই সকল উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ব্যতিরেকে এদেশে আরও কত কত মাতৃভক্ত মহাপুরুষ অপেক্ষাকৃত প্রচ্ছন্ন ভাবে মনের সুখে কালযাপন করিতেছেন তাহা কে বলিতে পারে? বিশালবারিধিগর্ভে কত মহামূল্য রত্ন অলক্ষিত ভাবে বিরাজিত রহিয়াছে, কে দেখিতে পায়? কত শত আরণ্য কুসুম নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রস্ফুটিত হইয়া বন সুশোভিত করে, কে তাহার সুগন্ধ আঘ্রাণ করিতে যায়? ফলতঃ মাতৃভক্তি ঐহিক সুখের নিদান, ইহাই পার্থিব মুক্তি।

এক্ষণে আমরা বর্ণনীয় বিষয়ের শেষ অঙ্কে উপস্থিত হইলাম। মাতৃভক্তি হইতে সন্তানের মুক্তি হয় কিনা, এক্ষণে আমরা সেই বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইব। শাস্ত্রবচনের সাহায্য ব্যতিরেকে ও সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝা যায়, মাতৃভক্তি হইতে সন্তানের মুক্তি হইতে পারে। মাতা সন্তানকে গর্ভেধারণ করিয়া অশেষ ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক প্রাণপণে তাহার লালন পালন করেন। মাতা পরম স্নেহময়ী; নিঃস্বার্থ মাতৃস্নেহের নিকট পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার স্নেহই পরাজিত, অধিক কি সমুজ্জ্বল পিতৃস্নেহও অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ। সুধাময় পূর্ণচন্দ্রে কলঙ্ক আছে, উহার হ্রাস বৃদ্ধি হয়, জগদালোককারী তপন দেবের দাহিকা শক্তি আছে, লোচনানন্দকর নক্ষত্রমালা অন্ধকার দূর করিতে পারে না, সমুজ্জ্বল সৌদামিনী ক্ষণপ্রভা বলিয়া জগতে অভিহিত, মনোহর কুসুমের সুগন্ধ অচিরস্থায়ী, কিন্তু মাতৃস্নেহ সম্পূর্ণ কলঙ্কবিহীন, দাহিকাশক্তির পরিবর্ত্তে অনুপম শৈত্যগুণ সম্পন্ন, উহা জীবের ক্লেশান্ধকার দূর করিয়া দেয় এবং চিরদিন অম্লানভাবে বিরাজিত থাকে,

সুতরাং পৃথিবীর কোন মনোহর পদার্থই মনোহারিত্ব বিষয়ে মাতৃস্নেহের তুল্য নহে। মাতৃস্নেহের এই মোহিনী শক্তিতে ভূমণ্ডলের ক্ষুদ্রতম কীট হইতে জীবশ্রেষ্ঠ মানব পর্য্যন্ত আবদ্ধ। সকলেই মাতার নিকট উপকৃত, সুতরাং সকলেরই অন্তঃকরণে মাতৃভক্তি স্বতঃই প্রকটিত হয়। কি নিরীশ্বরবাদী নাস্তিক * কি নিষ্ঠুরপ্রকৃতি দস্যু, কি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী বলদৃপ্ত ভূপতি, সকলেই মাতার নিকট অবনতমস্তক। সৌভাগ্যক্রমে মাতৃ-ভক্তিশূন্য পাষণ্ডের সংখ্যা পৃথিবীতে অতি অল্প। কৃতজ্ঞ সুসন্তানের মাতৃভক্তি সমধিক বলবতী হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? প্রসিদ্ধই আছে, ভক্তি উর্দ্ধগামিনী; মাতৃভক্তির প্রগাঢ়তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেই আমরা ক্রমে ক্রমে সেই অনাদি, অচিন্ত্য, অব্যক্ত পুরুষকে ভক্তি করিতে শিক্ষা করি। যিনি সমস্ত জগতের স্রষ্টা, যিনি সমস্ত জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্ত্তা, যিনি ইচ্ছামত সৃষ্টি স্থিতি লয় করিতে পারেন, যিনি অপার দয়ার সাগর, যিনি কৃপাপরবশ হইয়া সৃষ্টিরক্ষার উদ্দেশে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপা জননীদেবীর অন্তঃকরণে অসীমঅপত্যস্নেহ প্রদানপূর্ব্বক অপার মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন, যথার্থ মাতৃভক্ত সন্তান কি সেই সর্ব্বশক্তিমান্ বিশ্বনিয়ন্তাকে অন্তঃকরণের সহিত ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে? আর এই ঈশ্বরভক্তির প্রগাঢ়তা সহকারে যখন আমরা সর্ব্বপ্রকার ভোগবাসনাশূন্য

* সুবিখ্যাত ইউরোপায় পাণ্ডিত মহামতি কোমত্ নাস্তিক ছিলেন, কিন্তু তিনিও মুক্তকণ্ঠে মাতৃভক্তি ও পিতৃভক্তির অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন।

ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া অখিল ব্রহ্মাণ্ডদর্পণে কেবল তাঁহারই মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইতে দেখি, তখনই আমাদের মুক্তি লাভ হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, মাতৃভক্তি মুক্তিলাভের সোপান স্বরূপ। মাতৃভক্তি রূপ নদীপ্রবাহ সন্তানকে অনায়াসে ঈশ্বরপ্রেমরূপ মহার্ণবে নীতকরে এবং সেই প্রেমসাগরে অবগাহন করিয়া আমরা মুক্তিরূপ অমূল্য শুক্তি লাভ করিতে পারি।

"ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ" এই কথা বলিলে কয় জন তাহা সম্যকরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন? যাঁহার আকার নাই তাঁহাকে কিরূপে চিন্তা করা যাইবে? ফলতঃ জ্ঞানালোকবর্জ্জিত প্রাকৃত জনগণের নিকট ইহা অতি দুরূহ বিষয়। এই নিমিত্তই জনসাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থে অলৌকিক প্রতিভাশালী মহর্ষিগণ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের এক একটী বিশেষ শক্তিসম্পন্ন সাকার দেব দেবীর কল্পনা করিয়া সেই অচিন্ত্য অব্যক্ত পুরুষকে হৃদয়মন্দিরে ধারণা করিবার সুগম পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সোপানাবলীর সাহায্যে উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করা যায়, যেরূপ বর্ণমালার পরিচয়দ্বারা সুবৃহৎ দুরূহ গ্রন্থপাঠের অধিকারী হইতে পারা যায়, যেরূপ প্রথমতঃ সঙ্কলন, ব্যবকলন, গুণন ও ভাগহার এই কয়েকটী নিয়মশিক্ষা দ্বারা অতি জটিল গণিত শাস্ত্রের পারদর্শী হওয়া যায়, সেইরূপ এক একটী বিশেষশক্তিসম্পন্ন সাকার দেব দেবীর আরাধনা পরিশেষে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ নিরাকার পরব্রহ্ম চিন্তার পথ সুগম করিয়া দেয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

এক্ষণে দেখুন, যদি প্রতিমাপূজা পরব্রহ্ম চিন্তার অনুকূল, তবে সাক্ষাৎ ঈশ্বরী জননীর পূজা পরমব্রহ্ম চিন্তার অনুকূল কেন না হইবে? নিম্নলিখিত মহাবাক্যটী স্মরণ করুন :—

"যদ্গর্ভে জায়তে লোকো যস্যাঃ স্নেহেন জীবতি।
সা সাক্ষাদীশ্বরী মাতা কোঽস্তি মাতৃসমো গুরুঃ॥"

সমুদ্র জলস্থিত বাড়বাগ্নির ন্যায়, মেঘমধ্যস্থিত তড়িতের ন্যায় বালুকাসমাচ্ছন্ন ফল্গুনদীর অন্তঃপ্রবাহের ন্যায় মাতার রক্ত-মাংসময় দেহাভ্যন্তরে ঐশ্বরিক ভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। আমরা মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন, সুতরাং তাহা অনুভব করিতে পারি না, কিন্তু মাতৃভক্ত সন্তান তাহা সুন্দর অনুভব করিতে পারেন।

নিম্নলিখিত বচনটী দেখুন :—

"মাতরি যে গুণাঃ সন্তি তে সন্তি পরমেশ্বরে।
যতো মুক্তির্ভবত্যাশু পদং তস্যা নিষেবয়॥"

পরমেশ্বরের গুণ গুলি মাতার শরীরে বিদ্যমান রহিয়াছে, অতএব মাতৃপদ সেবা করিলে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। যে সমস্ত ঐশ্বরিক গুণ মাতার শরীরে বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে নিঃস্বার্থতা একটী মহদ্গুণ। পূর্ব্বে প্রমাণ করা গিয়াছে, মাতৃ-স্নেহ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ। মাতৃভক্তিপরায়ণ সন্তান মাতার নিকট হইতে সহজেই নিঃস্বার্থতা শিক্ষা করিতে পারে এবং এইরূপে নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই মোক্ষ লাভ হয়, সকল শাস্ত্রেই ইহা উল্লিখিত হইয়াছে।

মাতার প্রসন্নতা লাভ করিতে না পারিলে যে ঈশ্বর পরায়ণ সন্তানও মুক্তি অথবা সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন না, নাটোরাধিপতি

রাজা রামকৃষ্ণ তাহার উত্তম উদাহরণ স্থল। রাজা রামকৃষ্ণ সাধকচূড়ামণি ছিলেন, অনেকে অবগত আছেন; কিন্তু তদীয় মাতা রাণী ভবানী তাঁহার প্রতি কোন কারণে প্রসন্না ছিলেন না বলিয়া তিনি সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন নাই। পরিশেষে দৈববাণী অনুসারে তিনি মাতাকে প্রসন্না করিয়া ভগবতী কালিকার প্রসাদে সিদ্ধি লাভ করেন।

ভিন্ন ভিন্ন দেবীর ভিন্ন ভিন্ন বীজমন্ত্র। প্রথমে সেই বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবীগণের উপাসনা করিতে হয়। "মাতা" শব্দটী সমস্ত দেবীগণের বীজমন্ত্র স্বরূপ। যেরূপেই আরাধনা কর না কেন, প্রথমে "মা" অথবা "মাতা" বলিয়া আহ্বান না করিলে কিছুতেই আমাদের তৃপ্তি বোধ হয় না, আর "মা" বলিয়া উপাসনা করিলে যেমন ভক্তি প্রকাশ পায়, এমন আর কিছুতেই হয় না। "মা দুর্গে"! এই বলিয়া উপাসনা করিলে আমাদের মনে যাদৃশী প্রীতি ও ভক্তির আবির্ভাব হয়, দুর্গে, মহিষাসুরনাশিনি, উগ্রচণ্ডে প্রভৃতি সহস্র নামে অভিহিত করিয়াও কি আমরা তাহার অর্দ্ধেক প্রীতিলাভ করিতে পারি? অতএব সমস্ত দেবীর একমাত্র অদ্বিতীয় বীজমন্ত্ররূপিণী মাতাকে ভক্তি করিলে কেনই মুক্তি হইবে না?

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে "জননী স্বর্গাদপি গরীয়সী"। যদি জননী "স্বর্গাদপি গরীয়সী" হইলেন, তবে তাঁহার স্বরূপ কি? "ত্রিগুণাতীত" এই কথা বলিলে কি বুঝায়? উহা কেবল পরম ব্রহ্মকেই বুঝায়, কারণ তাঁহার সত্ত্ব, রজঃ, তম, এই তিন গুণের কোন গুণই নাই। সেইরূপ "স্বর্গাদপি গরীয়সী" বলিলে

মুক্তি বুঝায়। কারণ পুণ্য কর্ম্মের ফল শেষ হইলে স্বর্গভ্রষ্ট হইতে হয়, পুনর্ব্বার সংসারে জন্মগ্রহণও করিতে হয়; স্বর্গ চিরস্থায়ী নহে, মুক্তি চিরস্থায়ী, মোক্ষলাভ হইলে পুনর্জ্জন্ম হয় না, সুতরাং মুক্তি "স্বর্গাদপি গরীয়সী"। জননী ও "স্বর্গাদপি গরীয়সী"; অতএব মাতা মুক্তি স্বরূপিণী। সেই মুক্তিরূপা মাতার প্রতি অচলা ভক্তি করিলে এবং তদ্গত চিত্তে তাঁহার উপাসনা করিলে, মুক্তিলাভ হইবে, ইহাতে আর সংশয় কি?

এক্ষণে আমরা শাস্ত্রবচনের সাহায্য লইয়া প্রতিপন্ন করিব, মাতৃভক্তি ও মাতৃ উপাসনা হইতে সন্তানের মুক্তিলাভ হইতে পারে। সর্ব্বশাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে এবং সকলেই অবগত আছেন, গুরুদেবকে প্রগাঢ় ভক্তি করিলে মুক্তি লাভ হয়। গুরুদেবকে ভক্তি করিলে কি নিমিত্ত মুক্তি হয়? গুরুদেবের নমস্কার মন্ত্রগুলি স্মরণ করুন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন :—

"অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

যিনি মণ্ডলাকার অখণ্ড চরাচর ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন, সেই পরম পুরুষের পদপ্রদর্শনকারী গুরুদেবকে নমস্কার। আবার দেখুন :—

"অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

যিনি জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দ্বারা আমাদের অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেন, সেই গুরুদেবকে প্রণাম। পুনর্ব্বার দেখুন :—

"নমোঽস্তু গুরবে তস্মৈ ইষ্টদেব স্বরূপিণে।
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসার সজ্ঞকম্॥"

যাঁহার বাক্যরূপ অমৃত সংসারবিষ নষ্ট করে, সেই ইষ্টদেবতা স্বরূপ গুরুদেবকে আমি নমস্কার করি। বাস্তবিক সংসারবিষের জ্বালায় আমরা সকলে জর্জ্জরিত। সংসারে জরা, ব্যাধি, মরণ প্রভৃতি ক্লেশের তাড়নায় সকলেই প্রপীড়িত। অহংকার ও ভোগবাসনাপরবশ হইয়া ইন্দ্রিয়সেবী মনুষ্যগণ মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন, সুতরাং কর্ম্মফলে বারংবার সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া অনন্ত ক্লেশ ভোগ করে। বাস্তবিক সর্পফণার অধঃস্থিত ছায়ার ন্যায়, নিবিড় তামসী রজনীতে ক্ষীণখদ্যোতালোকের ন্যায় সংসারে সুখের ভাগ অতি অল্প, এত অল্প, যে নাই বলিলেও হয়। সংসারে ক্লেশও দুঃখের এরূপ আধিক্য দেখিয়াই বুদ্ধদেব ভোগ-বাসনাশূন্য ও সংসারসুখে বীতরাগ হন এবং ঐকান্তিক চেষ্টায় মুক্তিলাভ করেন। গুরুবাক্য ও গুরূপদেশ রূপ অমৃত সংসার-বিষের মহৌষধ। গুরুর উপদেশ বলে আমাদিগের মোহান্ধকার দূরীভূত হয় ও জ্ঞানবহ্নির বিকাশ হইতে থাকে, জ্ঞানলাভ হইলেই আমাদের মুক্তি লাভ হয়।

"গু শব্দ শ্চান্ধকারঃ স্যাদ্রুশব্দ স্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকার নিরোধিত্বাৎ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥" (গুরুগীতা)

গু শব্দের অর্থ অন্ধকার, রু শব্দে নিরোধ। অন্ধকার দূর করেন বলিয়া তাঁহার নাম গুরু হইয়াছে।

এক্ষণে দেখুন, গুরুভক্তিতে যদি মুক্তিলাভ হয়, তবে মাতৃ-ভক্তিতে কেনই বা মুক্তি লাভ করিতে পারা যাইবে না? পূর্ব্বে

প্রদর্শিত হইয়াছে, মাতার সমান আর গুরু নাই।

মনু লিখিয়াছেন :—

" উপাধ্যায়াদ্দশাচার্য্যঃ আচার্য্যাণাং শতং পিতা।

পিতুর্মাতা সহস্রেণ গৌরবেণাতিরিচ্যতে ॥"

আচার্য্য গৌরবে উপাধ্যায়ের দশগুণ, পিতা আচার্য্যের শত-গুণ এবং মাতা পিতার সহস্র গুণ গুরু। মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত আছে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বকরূপী ধর্ম্ম কর্ত্তৃক "পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর কে?" এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করিয়াছিলেন, "মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর।" বনপর্ব্বের অন্তর্গত মার্কণ্ডেয় সমস্যায় ধর্ম্মব্যাধ শৌনকনামক এক ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিতেছেন :—"পিতা, মাতা, অগ্নি, আত্মা ও উপদেষ্টা এই পাঁচ জন গুরু। এই পাঁচ জনের সহিত সম্যক্‌রূপে সদ্ব্যবহার করিলে প্রত্যহ অগ্নিসেবা সম্পন্ন হয়।" ধর্ম্মব্যাধ কেবল মাত্র পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তিপ্রভাবে যেরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ শৌনক অনেক তপস্যাতেও সেরূপ সিদ্ধ হইতে পারেন নাই।

মনু বলিয়াছেন :—

"পিতৈব গার্হপত্যোঽগ্নি র্মাতাগ্নি র্দক্ষিণঃ স্মৃতঃ।

গুরুরাহবনীয়স্তু সাগ্নি ত্রেতা গরীয়সী ॥"

পিতাই গার্হপত্য অগ্নি, মাতাই দক্ষিণাগ্নি ও আচার্য্যই আহ-বনীয় অগ্নি; এই তিন অগ্নিই গুরুতর।

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, যদি গুরুদেবকে ভক্তি করিলে মুক্তি লাভ হয়, তবে মহাগুরু মাতাকে ভক্তি করিলে কেনই বা মুক্তি না হইবে? যদি বলেন, গুরুদেব অথবা মাতা মূর্খতা বশতঃ

উপদেশদানে জ্ঞানপ্রদান করিতে না পারিলে কিরূপে মুক্তি হইবে? তাহার উত্তর এই, গুরুদেব অথবা মাতা উপদেশ দান না করিলেও কেবল মাত্র প্রগাঢ় ভক্তি প্রভাবে স্বতঃই জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে :—

"ভক্তিরুদ্বোধয়ত্যেকা বৃত্তিঃ সর্ব্বাহি সাত্ত্বিকীঃ।
যথৈব নলিনীঃ সুপ্তাঃ প্রভাতত্তরণিপ্রভা॥"

(সদ্ভাব)

যেমন বালসূর্য্যের প্রভা নিমীলিত নলিনীবৃন্দকে প্রস্ফুটিত করে, সেইরূপ একমাত্র ভক্তিই হৃদয়ের সমস্ত সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ করিয়া দেয়। ইহাকেই ভক্ত্যাত্মক জ্ঞান বলে, আর এই জ্ঞানই সর্ব্বোত্তম।

"জ্ঞানং পঞ্চবিধং প্রোক্তং সর্ব্ববেদেষু সম্মতং।
ভক্ত্যাত্মকং সর্ব্বপরং তেষাঞ্চ লক্ষণং শৃণু॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ)

কেবল মাত্র ভক্তি প্রভাবে উপদেশ বিনা যে জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়, মহাভারতের আরুণি, উপমন্যু ও একলব্য তাহার উত্তম দৃষ্টান্ত স্থল। আরুণি ও উপমন্যু যত দিন গুরুগৃহে ছিলেন, এক দিনের নিমিত্তও গুরু তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র উপদেশ দেন নাই, কিন্তু কেবল অচলা গুরুভক্তি প্রভাবে গুরুর প্রসন্নতা লাভ করিয়াই তাঁহারা জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন। একলব্য নীচ জাতীয় বলিয়া দ্রোণাচার্য্য কিছুতেই তাঁহাকে অস্ত্র শিক্ষা প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না, কিন্তু দ্রোণের প্রতি সেজন্য তাঁহার ভক্তির কিছুমাত্র শৈথিল্য হয় নাই, আর সেই অচলা ভক্তির

প্রভাবেই তিনি শিক্ষিত না হইয়াও ধনুর্ব্বিদ্যায় এরূপ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিয়া ছিলেন, যে দ্রোণাচার্য্যের প্রিয়তম ছাত্র অর্জ্জুনও একলব্যের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। একলব্যের এরূপ অচলা গুরুভক্তি ছিল, যে আপনার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি ছেদন করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতেও কিছুমাত্র কাতর হন নাই। একলব্য, আরুণি ও উপমন্যুর গুরুভক্তির ন্যায় সন্তানের অচলা মাতৃভক্তি থাকিলে, সে সন্তান বিনা উপদেশেও জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

সাংখ্য দর্শনের মতে পুরুষ ও প্রকৃতির যোগে সমস্ত জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। পুরুষ চৈতন্যময়, কিন্তু প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ, তম এই ত্রিগুণময়ী। সত্ত্ব রজঃ, তম এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলে। পুরুষ প্রকৃতির নিত্য সম্বন্ধ। অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় পুরুষ প্রকৃতির সহিত নিত্য সংশ্লিষ্ট। পুরুষ প্রকৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া প্রকৃতির ঐ তিন গুণের সাম্যাবস্থার বৈষম্য সম্পাদন করেন এবং এইরূপে সমস্ত জগৎ সৃষ্ট হইয়া থাকে। ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সেই প্রকৃতি মহদ্ব্রহ্ম নামে অভিহিত হইয়াছেন :—

"মম যোনি র্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ব্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥
সর্ব্ব যোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনি রহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥
সত্ত্বং রজ স্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥"

মহদ্ব্রহ্ম আমার গর্ভাধান স্থান; আমি তাহাতে গর্ভসঞ্চিত করি; হেভারত! তাহা হইতেই সর্ব্বভূতের জন্ম হয়। হে কৌন্তেয়! মনুষ্যাদি সমস্ত যোনিতে যে সমস্ত স্থাবর জঙ্গমাদি মূর্ত্তি সম্ভূত হয়, মহদ্ব্রহ্ম সেই সকলের উৎপত্তি স্থান এবং আমি বীজপ্রদ পিতা। প্রকৃতিসম্ভব সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ অব্যয়রূপ দেহীকে দেহে বদ্ধ করে।

তবেই দেখুন দেহী মাত্রেই অব্যয় পরম ব্রহ্ম স্বরূপ, কেবল প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণই তাহাকে দেহে বদ্ধ করিয়া রাখে। যখন ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া দেহী এতদূর উন্নত হইয়া উঠিতে পারে যে, প্রকৃতির সেই গুণত্রয়ের স্বরূপ অবগত হইয়া সে তাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, তখনই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ভগবদ্গীতায় ত্রয়োদশ সর্গে তাহাই উক্ত হইয়াছে :—

"য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে॥"

যিনি এইরূপে পুরুষকে ও গুণত্রয় সমন্বিতা প্রকৃতিকে জানিতে পারেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে রত থাকিলেও আর জন্মান্তর গ্রহণ করেন না অর্থাৎ তাঁহার মুক্তি হয়। জননী সাক্ষাৎ প্রকৃতি স্বরূপিণী এবং পিতা সাক্ষাৎ পুরুষ স্বরূপ, ইহাতে কি কেহ সন্দেহ করেন?

"পুরুষাদ্বীর্য্যমুৎপন্নং বীর্য্যাৎ সন্ততিরেবচ।
তয়ো রাধার রূপাচ কামিনী প্রকৃতেঃ কলা॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ)

প্রকৃতিরূপা মাতাকে ভক্তি করিলে সন্তানের নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ হইবে। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে লিখিত আছে :—

"নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা॥"

এই শ্লোকটী পাঠ করিয়া মাতা যে সাক্ষাৎ চণ্ডী, ইহাতে আর কাহার সন্দেহ থাকিতে পারে? মাতা সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার ন্যায় আমাদিগকে আহার প্রদান করেন এবং অসুরনাশিনী জগদম্বার ন্যায় নিয়তই আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন, একথা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই অসঙ্কুচিতচিত্তে স্বীকার করিবেন। মাতৃভক্তি করিলে চণ্ডীকেই ভক্তি করা হয়। আর, সেই সর্ব্বকামপ্রদা দেবী চণ্ডিকা চতুর্ব্বর্গ লাভের সুপ্রশস্ত উপায়, ইহা সকলেই অবগত আছেন। এই বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ শাস্ত্রসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা কেবল একটী মাত্র প্রমাণ এস্থলে উদ্ধৃত করিব।

"সা বিদ্যা পরমামুক্তে র্হেতুভূতা সনাতনী"

(মার্কণ্ডেয় চণ্ডী)

রুচিস্তোত্রে লিখিত আছে :—

"পিতৃন্ নমস্যে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ।
স্বধাভুজঃ কাম্য ফলাভিসন্ধৌ॥
প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং।
বিমুক্তিদা যেহনভিসংহিতেষু॥

স্বর্গস্থিত স্বধাভোজী পিতৃগণ কাম্যফলাভিলাষী সন্তানকে সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করেন এবং নিষ্কাম সন্তানকে মুক্তি দান করিয়া থাকেন। ভক্তিপরায়ণ সন্তানকে পিতৃগণের যে মুক্তিদানের শক্তি আছে, তাহা উপরিলিখিত বচনটীতে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। অতএব নিষ্কাম মাতৃভক্তি ও মাতৃউপাসনাতে সন্তানের কেন মুক্তি হইবে না ?

পদ্মপুরাণান্তর্গত ক্রিয়াযোগসারে পিতা মাতার প্রতি ভক্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে :

"যৎকিঞ্চিদ্দীয়তে ভক্ত্যা পিতৃবক্ত্রে পরন্তপ।
তদশ্নাতি স্বয়ং বিষ্ণুঃ পিতৃরূপো যতোহরিঃ॥
প্রত্যক্ষদেবৌ পিতরৌ সেবন্তে যে মহাশয়াঃ।
সর্ব্বসিদ্ধি র্ভবেত্তেষাং প্রসাদাজ্জগতীপতেঃ॥
পিতৃভক্তিং বিনা যাবৎ দিনং তিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
তাবৎ কল্প সহস্রানি তিষ্ঠন্তি নরকে জনাঃ॥"

উপরি লিখিত বচনে "পিতৃবক্ত্রে" "প্রত্যক্ষ দেবৌ পিতরৌ' এবং "পিতৃভক্তিং" এই কয়েক স্থলে পিতৃপদ মাতার ও পিতার বাচক। একশেষ সমাস, সুতরাং মাতা ও পিতা উভয়কেই বুঝাইতেছে। দ্বিতীয় শ্লোকটীর বাঙ্গালায় এইরূপ অর্থ :—যে মহাশয়েরা প্রত্যক্ষ দেবতা মাতা ও পিতার সেবা করেন, তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি লাভ হয়। সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিলাভ হইলে আর কি বাকী রহিল ? অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়। এক্ষণে দেখুন মাতৃভক্তি ও মাতৃ উপাসনাতে সন্তানের নিশ্চিতই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

বহ্নি পুরাণে লিখিত আছে :—

" মাতুশ্চ যদ্ধিতং কিঞ্চিৎ কুরুতে ভক্তিতঃ পুমান্।
তদ্ধর্ম্মং হি বিজানীয়াৎ এবং ধর্ম্মবিদো বিদুঃ॥"

ভক্তিপূর্ব্বক পুরুষ মাতার যে কিছু হিতকর্ম্ম করেন, তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। ধর্ম্মাচরণ করিলে মুক্তি হয় না কি? ধর্ম্ম পরমব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণে তাহা সুস্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে; বাহুল্য ভয়ে সে শ্লোক গুলি উদ্ধৃত হইল না।

মহাভারতের শান্তি পর্ব্ব দেখুন :—

" মাতা পিত্রোর্গুরূণাঞ্চ পূজা বহুমতা মম।
ইহ যুক্তো নরো লোকান্ যশশ্চ মহদশ্নুতে॥"

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিতেছেন, মাতা পিতা ও গুরুজনের পূজাই আমার বহু মানের সামগ্রী এবং আমার সম্মত। উহাতে নিরত মনুষ্য মহৎযশঃ ও পুণ্যধাম লাভ করিয়া থাকে।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের বচন দুইটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

" তুষ্টায়াং মাতরি শিবে তুষ্টে পিতরি পার্ব্বতি।
তব প্রীতির্ভবেদ্দেবি পরব্রহ্ম প্রসীদতি॥
ত্বমাদ্যে জগতাং মাতা পিতা ব্রহ্ম পরাৎপরং।
যুবয়োঃ প্রীণনং যস্মাৎ তস্মাৎ কিং গৃহিণাস্তপঃ॥"

পিতা মাতা সন্তুষ্ট হইলে পরব্রহ্মের প্রীতি জন্মে। পরব্রহ্ম প্রীত হইলে মুক্তি লাভ হয়, সকলেই অবগত আছেন।

অতঃপর প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মহামান্য মনুর নিম্নলিখিত বচনগুলি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে, মাতৃভক্তি এবং মাতৃউপাসনাতে সন্তানের মুক্তি হয়:—

(ক) "আচার্য্যো ব্রহ্মণো মূর্ত্তিঃ পিতা মূর্ত্তিঃ প্রজাপতেঃ।
মাতা পৃথিব্যা মূর্ত্তিস্তু ভ্রাতা স্বো মূর্ত্তিরাত্মনঃ॥"

আচার্য্যই বেদান্তপ্রতিপাদ্য পরমাত্মার মূর্ত্তি, পিতা হিরণ্য-গর্ভ প্রজাপতির মূর্ত্তি ; ভ্রাতা সাক্ষাৎ আপনার দ্বিতীয় মূর্ত্তি এবং মাতা পৃথিবীর মূর্ত্তি। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে "মাতা সাক্ষাৎ ক্ষিতেস্তনুঃ।" এক্ষণে মাতা পৃথিবীর মূর্ত্তি বলিয়া সপ্রমাণ হইলেন। পৃথিবী বিষ্ণুপত্নী, পৃথিবীর নমস্কারমন্ত্রে ইহা অবগত হওয়া যায় :—

"সমুদ্রমেখলে দেবি পর্ব্বতস্তনমণ্ডলে।
বিষ্ণুপত্নি নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে॥"

হে দেবি! সমুদ্র তোমার মেখলা এবং পর্ব্বত তোমার স্তন মণ্ডল, তুমি বিষ্ণুপত্নী, তোমাকে নমস্কার, তুমি আমার পাদস্পর্শ ক্ষমা কর। তবেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে মাতাকে ভক্তি করিলে বিষ্ণুপত্নীকে ভক্তি করা হয়। বিষ্ণুপত্নী যে মুক্তিদায়িনী তাহাতে আর সংশয় কি ?

(খ) "তয়ো নিত্যং প্রিয়ং কুর্য্যাদাচার্য্যস্য চ সর্ব্বদা।
তেষ্বেব ত্রিষু তুষ্টেষু তপঃ সর্ব্বং সমাপ্যতে॥"

পিতা মাতা ও আচার্য্যের সর্ব্বদা হিত সাধন দ্বারা প্রীতি উৎপাদন করিবে, যেহেতু ইহাঁরা সন্তুষ্ট থাকিলে সকল তপস্যার ফল পাওয়া যায়।

(গ) "ত্রিষ্বেতে দ্বিতি কৃত্যংহি পুরুষস্য সমাপ্যতে।
এষঃধর্ম্মঃ পরঃ সাক্ষাদুপধর্ম্মোঽন্য উচ্যতে॥"

যেহেতু ইহাঁরা তিন জনে উত্তমরূপে শুশ্রূষিত হইলেই পুরুষের শ্রৌত, স্মার্ত্ত সমুদায় কর্ত্তব্য কর্ম্মই সমাপ্ত হয়, অতএব ইহাকেই পুরুষার্থ সাধন বলিয়া উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলা যায়, তদ্ভিন্ন অগ্নিহোত্রা-দিকে উপধর্ম্ম অর্থাৎ নিকৃষ্ট ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে।

(ঘ) "তেষাং ত্রয়াণাং শুশ্রূষা পরমন্তপ উচ্যতে।
নতৈরভ্যনুজ্ঞাতো ধর্ম্মমন্যং সমাচরেৎ॥"

এই তিন জনের সেবা শুশ্রূষাই পরম তপস্যা, অর্থাৎ ইহাঁদের সেবা করিলেই সর্ব্বপ্রকার তপস্যার ফল পাওয়া যায়। যদি অন্য কোনরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার অভিলাষ হয়, তাহাও ইহাঁ-দিগের অনুমতি ব্যতিরেকে করিবে না।

(ঙ) "ত এবহি ত্রয়ো লোকাস্ত এব ত্রয় আশ্রমাঃ।
ত এবহি ত্রয়ো বেদাস্ত এবোক্তাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ॥"

যেহেতু ইহাঁরা তিন জনই ত্রিলোক প্রাপ্তির হেতু, ইহাঁরাই ব্রহ্মচর্য্যাদি তিন আশ্রম লাভের হেতু, ইহাঁরাই ত্রিবেদাধ্যয়নের ফলদাতা, ইহাঁরাই ত্রেতাগ্নি দ্বারা নিষ্পাদিত যজ্ঞাদি কর্ম্মের ফলদাতা।

(চ) "ত্রিষ্বপ্রমাদ্যন্নেতেষু ত্রীন্ লোকান্ বিজয়েদ্গৃহী।
দীপ্যমানঃ স্ববপুষা দেববদ্দিবি মোদতে॥"

যিনি ইহাঁদিগের প্রতি সতত সাবধান থাকেন, তিনি গৃহী হইলেও ত্রিলোক পরাজয় করিতে পারেন, অর্থাৎ ত্রিলোকের আধিপত্য প্রাপ্ত হন, এবং স্বশরীরে সূর্য্যাদির ন্যায় প্রকাশমান হইয়া দ্যুলোকে বিমলানন্দ ভোগ করেন।

মনুর বচন গুলি অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, পিতা, মাতা ও গুরুর প্রতি ভক্তি ও তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করিলে সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়, পরলোকে সদ্গতি হয় এবং সকল তপস্যার ফল লাভ করা যায়। এক্ষণে মৈত্রেয় উপনিষৎ গ্রন্থে তপস্যায় কি ফললাভ হয় লিখিত হইয়াছে, একবার পাঠ করুন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন, মাতৃভক্তি ও মাতার উপাসনাতে মুক্তি হয় কিনা?—

"তপসা প্রাপ্যতে সত্বং সত্বাৎ সংপ্রাপ্যতে মনঃ।
মনসা প্রাপ্যতে ত্বাত্মা হ্যাপ্তাত্মা ন নিবর্ত্ততে॥"

তপস্যা দ্বারা সত্ব, সত্ব দ্বারা মন এবং মন দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আত্মপ্রাপ্তি হইলে সংসারে যাতায়াত নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। অতএব মাতৃভক্তি এবং মাতার উপাসনা যে মুক্তি লাভের সুপ্রশস্ত পথ তাহাতে আর সংশয় কি?

পরশুরামের প্রতি দুর্ব্বাসার উপদেশ বাক্যটী স্মরণ করুন :—

"বাজপেয় সহস্রাদ্ধি হয়মেধোঽতিরিচ্যতে।
সহস্র হয়মেধাচ্চ মাতৃভক্তি র্বিশিষ্যতে॥"

অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল বাজপেয় যজ্ঞের সহস্র গুণ, কিন্তু মাতৃ-ভক্তির ফল আবার অশ্বমেধ যজ্ঞের সহস্র গুণ।

আবার দেখুন :—

"ন স পুনরাবর্ত্ততে মাতৃসেবী" ইতি শ্রুতিঃ।

মাতৃসেবী ব্যক্তির পুনর্জ্জন্ম হয় না, অর্থাৎ তাহার মুক্তি হয়। নিম্নলিখিত শাস্ত্রবচনটীতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, মনুষ্য মাতৃভক্ত হইলে মুক্তি লাভ করে :—

"ভজস্ব ভক্ত্যাহে ব্রহ্মণ্ মাতরং পরমেশ্বরীং।
যামারাধ্য নরো যাতি মোক্ষধামাপুনর্ভবম্॥"

মাতৃভক্তিতে সন্তানের মুক্তি হয় বটে, কিন্তু সে ভক্তি কি প্রকার? মাতাকে সাক্ষাৎ প্রকৃতি স্বরূপিণী মনে করিয়া এক মনে এক প্রাণে প্রগাঢ়ভক্তি করিতে হইবে। নতুবা লোক লজ্জাভয়ে, স্বার্থসাধনোদ্দেশে, ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য অথবা সুখ্যাতি লাভ করিবার অভিপ্রায়ে অন্তরে ভক্তি-শূন্য হইয়া বাহ্যভক্তি প্রদর্শন করিলে হইবে না। অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার পরীক্ষাসময়ে মন ও দৃষ্টির একাগ্রতা বশতঃ মহাবীর অর্জ্জুন শরনিক্ষেপ দ্বারা বৃক্ষোপরিস্থ কৃত্রিম পক্ষীর মস্তক চ্ছেদন করিয়া ভূমিতে পাতিত করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃবর্গ সেরূপ একাগ্রচিত্ত ও একাগ্রদৃষ্টি হইতে পারেন নাই বলিয়াই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে সমর্থ হন নাই। কৃত্রিম পক্ষীর মস্তক চ্ছেদন করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে "বৎস! তুমি এক্ষণে কি কি পদার্থ নিরীক্ষণ করিতেছ?" আচার্য্য দ্রোণ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া অর্জ্জুন উত্তর করিয়াছিলেন, বৃক্ষস্থিত পক্ষীর মস্তক ব্যতিরেকে আর কিছুই আমার নয়ন গোচর হইতেছে না। এই বাক্য অর্জ্জুনের অসামান্য একাগ্রচিত্ততার সম্পূর্ণ পরিচায়ক। মুমুক্ষু সন্তানের মাতৃ ভক্তি বিষয়েও সেইরূপ একাগ্রতা শিক্ষা করা উচিত। মাতাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরী বোধে শয়নে স্বপনে সর্ব্বদাই আরাধনা করা এবং অখিল সংসার তন্ময় জ্ঞান করা আবশ্যক। এইরূপ মাতৃভক্তিই মোক্ষলাভের কারণ। বিল্বমঙ্গল বলিয়াছিলেন :—

"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোহসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতং।
হৃদয়াদ্ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামিতে॥"

হে কৃষ্ণ তুমি বল পূর্ব্বক আমার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যাইতেছ ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যদি তুমি আমার হৃদয় ছাড়াইয়া যাইতে পার, তবেই তোমার পৌরুষ বলি। এইরূপ ভক্তিই যথার্থ ভক্তি !!!

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, মাতৃভক্ত সন্তান যদি অন্যান্য বিষয়ে পাপিষ্ঠ ও দুরাত্মা হয়, তবে তাহার মুক্তিলাভ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এরূপ প্রশ্ন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও হাস্যোদ্দীপক। ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি কখন কি পাপিষ্ঠ হইতে পারেন? মাতা সাক্ষাৎ ঈশ্বরী, মাতৃভক্ত সন্তানের পাপাচরণ করা কি কখন আশা করা যায়? পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকে আপাততঃ মাতৃভক্ত বলিয়া বোধ হইলেও বুঝিতে হইবে, তাহার ভক্তি আন্তরিক নহে, কোনরূপ স্বার্থের অনুরোধে সে বাহ্যাড়ম্বর সহকারে মাতৃভক্তির ভাণ করিতেছে। পাপের সংস্পর্শ মাত্র থাকিলে মনে কখনই প্রকৃত ভক্তির উদয় হইতে পারে না। প্রথমে আত্মার পবিত্রতা সাধন করিতে হইবে, তবে সেই বিশুদ্ধ আত্মক্ষেত্রে প্রকৃত ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হইবে। কেবল পবিত্র জলে স্নান করিলেই আত্মার পবিত্রতা জন্মে না; ভোগবাসনা-শূন্য ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া দেহস্থিত দুর্জ্জয় রিপুগণের উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিতে হইবে, তবেই আত্মার বিশুদ্ধতা জন্মিতে পারে। এইরূপ পবিত্র আত্মাই প্রকৃত ভক্তিরসের একমাত্র

উৎস। মহাভারতের অন্তর্গত শান্তিপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উপদেশ বাক্য স্মরণ করুন :—

"আত্মানদী সংযমপুণ্যতীর্থা সত্যোদকা শীলতটা দয়োর্ম্মিঃ।
তত্রাভিষেকং কুরু পাণ্ডুপুত্র! ন বারিণা শুধ্যতি চান্তরাত্মা॥"

দম গুণ যাহার তীর্থ (ঘাট), সত্যই যাহার সলিল, শীলতা যাহার তট; দয়া গুণ যাহার তরঙ্গ, হে পাণ্ডুপুত্র! তুমি সেই আত্মরূপ নদীতে স্নান কর। অন্য জলে অন্তরাত্মার পবিত্রতা জন্মে না। কবীর বলিয়াছেন :—

"কামী, ক্রোধী, লাল্‌চী, ইন্ হতে ভক্তি না হোয়ে।
ভক্তি করে কৈ শূরীয়া, তন্ মন্ লজ্জা খোয়ে॥"

কামী, ক্রোধী ও লোভী ইহাদের ভক্তি হয় না। শরীর, মন ও লজ্জা ইহা নষ্ট করিয়া কোন কোন শূর ভক্তি করিয়া থাকেন। বাস্তবিক পাপমরীচিকার প্রলোভনে মনোমৃগ যদি অস্থির হইয়া নিয়তই সংসারমরুভূমিতে ধাবমান হইতে থাকিল, তবে আর কিরূপে সে ভক্তিসুধা পান করিতে অবসর পাইবে? তরঙ্গাকুলিত পঙ্কিল জলে কখন কি প্রকৃতির মনোহারিণী ছায়া প্রতিফলিত হইতে পারে? কেবল সুমিষ্ট বাক্যে স্তব ও চরণ বন্দনা করিলেই ভক্তি করা হয় না; চন্দন, পুষ্প, ধন, বস্ত্র, অলঙ্কার ও সুখাদ্য প্রদান করিলেই যে পূজা ও উপাসনা করা হইল, এরূপ নহে। এগুলি কার্য্য বটে, এই সকল কার্য্য হইতে যথার্থ ভক্তি ক্রমে ক্রমে উদিত হইতে পারে। যথার্থ ভক্তি ও উপাসনার লক্ষণ অন্যরূপ। প্রকৃত ভক্তি ও উপাসনার মর্ম্ম বোধের জন্য নিম্নে একটী সুন্দর গান উদ্ধৃত করা গেল :—

"মা আমার অন্তরে জাগ গো কুলকুণ্ডলিনি,
তোমায় অন্তরেতে রাখি নিয়ত নিরখি
অন্তর না করি দিবা রজনী॥
করি উপাসনা সগুণে বাসনা,
পুরাও স্ববাসনা করুণা করি,
মম মানসমন্দিরে পূজিয়ে তোমারে,
জনম সফল করি জননি॥
ভক্তিপুষ্প করি শ্রদ্ধা সচন্দন,
তদঞ্জলি পদে করিব অর্পণ,
নেত্র মুদে মন সাধে কালী রূপ করি দরশন॥
কামাদি ছয় বলি দিব গো করালি,
বিবেকঅসি করে ধারণ করি,
আমি জ্ঞানাগ্নি জ্বালিব হিংসাহুতি দিব,
তবে যদি ব্রজে ঘটে শিব শিবানি॥"

এক্ষণে দেখিতে পাওয়া গেল, সন্তান যথার্থ মাতৃভক্ত হইলে পাপমতি হইতে পারে না। কিন্তু যদি সন্তান পূর্ব্বে পাপমতি ছিল, পশ্চাৎ ঈশ্বরানুগ্রহে মাতৃভক্ত হইয়া উঠিল, এরূপ হয়, তাহা হইলেও তাহারি পূর্ব্বাচরিত পাপান্ধকার মাতৃভক্তি রূপ কৌমুদী প্রভায় বিদূরিত হইতে পারে। গোভিলরহস্যের বচনটী স্মরণ করুন:—

"তরেদতি পাতকী গৃহদেবীভক্ত্যা।"

গৃহদেবী মাতার প্রতি ভক্তি করিলে মহাপাপীও পরিত্রাণ পায়। পূর্ব্বাচরিত পাপরাশি যে পুণ্য কর্ম্ম ও ঐকান্তিক ঈশ্বর-

ভক্তি দ্বারা খণ্ডিত হয়, আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকিই তাহার উত্তম উদাহরণ স্থল। বাল্মীকি প্রথমে রত্নাকর নামে খ্যাত এবং ঘোরতর মহাপাতকী ছিলেন, কিন্তু উত্তর কালে পূর্ণব্রহ্ম রাম চন্দ্রের প্রধান ভক্ত হইয়া ঘোরতর তপস্যা প্রভাবে সর্ব্ব পাপ বিমুক্ত হইয়া ছিলেন। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, মাতৃভক্তির ন্যায় আর তপস্যা নাই, তবে মাতৃভক্তি দ্বারা সন্তানের পূর্ব্বাচরিত পাপের নাশ হইবে না কেন? পবিত্র প্রেম বা ভক্তিরূপ জাহ্নবীসলিল সর্ব্বপাপনাশক। উহা ঈশ্বর হইতে সমুৎপন্ন আবার ঈশ্বরেই মিলিত :—

"ঈশ্বরাদ্রি সমুদ্ভূতা যেশ্বরাম্বুধি গামিনী।
প্রেম দ্রবময়ী ধারা সৈব গঙ্গা সনাতনী॥"

(সদ্ভাব)

যে দ্রবময়ী প্রেম ধারা ঈশ্বর রূপ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া পুনরায় ঈশ্বররূপমহাসাগরেই মিলিত হইয়াছে, তাহারই নাম সনাতনী গঙ্গা। যেরূপ ভক্তিভাবে পুণ্যতোয়াজাহ্নবীজলে স্নান করিলে সর্ব্ব পাপ নষ্ট হয়, সেইরূপ ভক্তিরূপ সনাতনী গঙ্গায় অবগাহন করিলে চিরসঞ্চিত কলুষ রাশি বিদূরিত হইয়া অন্তরাত্মা নির্ম্মল ও পবিত্র হয়। ভক্তি ঐশ্বরিক সামগ্রী, প্রথমে যাহাকেই ভক্তি কর, অবশেষে উহা ঈশ্বরের দিকেই পরিচালিত হইয়া থাকে। সাগরগামিনী স্রোতস্বতী নানা পথে প্রবাহিত হইয়া পরিশেষে সাগরে আসিয়াই মিলিত হয়। আর অশেষ কল্যাণকারিণী জননীর প্রতি সেই ভক্তি প্রথমতঃ প্রগাঢ়রূপে স্বতঃই প্রকটিত হওয়া সম্ভবপর, কারণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জননীর ন্যায় হিতকারিণী আর

কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। ভক্তকুলতিলক রামপ্রসাদ বলিয়া গিয়াছেন :—

"সকলের সার ভক্তি মুক্তি তার দাসী।"

হে অজ্ঞানান্ধ মানবগণ! আর তোমরা মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিয়া পরমারাধ্যা জননীকে সামান্যা মানবী জ্ঞানে অনাদর পূর্ব্বক পরলোকে দুর্গতি সঞ্চয় করিও না। সাক্ষাৎ ঈশ্বরীর ন্যায় ভক্তিভাবে তাঁহাকে হৃদয়মন্দিরে ধারণ করিয়া পূজা করিতে থাক, অনায়াসে এই গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই মোক্ষ লাভ করিতে পারিবে। যে মুক্তি লাভের প্রয়াসে যোগী ঋষিগণ নিবিড় অরণ্যে, পর্ব্বত কন্দরে, বহুকাল ব্যাপিয়া কঠোর তপশ্চরণ পূর্ব্বক নানাবিধ ক্লেশ সহ্য করেন, তোমরা যদি গৃহস্থাশ্রমের সুখ সম্ভোগ করিতে করিতে অনায়াসে সেই মুক্তি লাভ করিতে পার' তাহা কি বাঞ্ছনীয় নহে? যেরূপ সূর্য্য মণ্ডল এই সৌর জগতের কেন্দ্র, সেইরূপ স্নেহময়ী মাতাও এই গার্হস্থ্যাশ্রমের কেন্দ্র স্থানীয়া; আমরা সকলে মাতার স্নেহে আকৃষ্ট ও তাঁহার বাৎসল্য রশ্মিতে পরিপুষ্ট হইয়া নিয়ত এই সংসার চক্রে পরিভ্রমণ করিতেছি। ফলতঃ করুণাময় ঈশ্বরই এই সংসারপাদপের আদি বীজ; জননী তাহার মূল; জনক কাণ্ড; অপত্যবর্গ শাখা প্রশাখা; শান্তি তাহার সুমিষ্ট রস এবং মুক্তিই মনোজ্ঞ ফল।

সমাপ্ত।

'ভাতের ফেন গালা অকর্ত্তব্য, তজ্জন্য এদেশবাসীগণ হীনবল ও নির্দ্ধন হইতেছে।

পাবনা জেলার অন্তর্গত পাকুড়িয়া গ্রাম নিবাসী
শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্র নাথ সাহা প্রণীত।

ভূমিকা।

ভাতের ফেন গালা প্রথা আমাদের দেশে বহুকাল ব্যাপিয়া প্রচলিত। আমরা হঠাৎ এতদিন পরে কেন এই দীর্ঘকাল-প্রচলিত প্রথার বিরোধী হইয়া উঠিলাম, কেনই বা আমরা ৺মাতৃ দেবীর উদ্দেশে এতদ্বিষয়ক প্রবন্ধ খানি প্রকাশিত করিলাম, তাহা জানিতে বোধ হয়, অনেকের কৌতূহল জন্মিতে পারে। নিতান্ত শৈশবাবস্থায় আমরা মাতৃস্তন্য পান করিয়া জীবনধারণ করি, বয়োবৃদ্ধি সহকারে গোদুগ্ধে আমাদের প্রাণ-রক্ষা পায়, অবশেষে আমরা অন্নাহার করিয়া বাঁচিয়া থাকি। অন্নই আমাদের দেশের প্রধান ও উপযুক্ত আহার্য্য সামগ্রী। অতএব উপকারিত্ব বিষয়ে জননী, গাভী ও অন্ন, এই তিনই প্রায় সমান। এই কারণেই বোধ হয়, ধান্যও অন্ন "মা লক্ষী' বলিয়া সাধারণতঃ অভিহিত হইয়া থাকে। অন্নের ফেননিঃসারণ করিয়া ফেলিলে উহার সারাংশ অনেকটা নির্গত হইয়া যায়, সুতরাং উহাতে "মা লক্ষীর" অপব্যয় হইয়া থাকে মাত্র। পাঠক মহাশয়! এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন, কিজন্য আমরা "ভাতের ফেন গালা অকর্ত্তব্য" ইত্যাদি বিষয়ক প্রবন্ধ ৺মাতৃ দেবীর নামে উৎসর্গীকৃত করাইয়া প্রকাশিত করিতেছি?

এই প্রবন্ধটীকে অনেকে অকিঞ্চিৎকর এবং বহুকালপ্রচলিত প্রথার বিরোধী মনে করিয়া উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু যদি

তাঁহারা অভিনিবেশ সহকারে প্রবন্ধটী পাঠ করেন এবং কুসংস্কার-শূন্য হইয়া মনে মনে বিচার করিয়া দেখেন, তাহা হইলে, বিষয়টী যে গুরুতর তাহা বুঝিতে পারিবেন। অনেক গুলি কুপ্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, কিন্তু চিরাচরিত বলিয়া কেহই সেই গুলির পরিহার করিতে প্রবৃত্ত হয়েন না। বস্তুতঃ সে গুলি বর্দ্ধনোন্মুখ সমাজে আর স্থান পাইবার যোগ্য নহে। যদি "ভাতের ফেন গালা" অকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে ভাতের ফেন না গালিলেও সমাজ কখনও খড়্গহস্ত হইবে না, প্রত্যুত উহার উপকারিতা ক্রমশঃ অনুভব করিয়া ঐ কুপ্রথার উচ্ছেদসাধনে অনুমোদন করিতে পারে, এরূপ আশা করা যায়। আমাদের দৌর্ব্বল্যের নানা গুরুতর কারণ বর্ত্তমান আছে সন্দেহ নাই, তন্মধ্যে ফেননিঃসারিত অন্নভোজন যে একটী প্রবল কারণ, তাহা প্রবন্ধপাঠে সম্যক বুঝিতে পারা যাইবে। যদি অখাদ্য ভোজন না করিয়া, যদি শাস্ত্রবিগর্হিত কর্ম্ম না করিয়া কেবল মাত্র সফেন অন্ন ভোজন করিয়া বিনা ব্যয়ে অতি সহজে আমরা জাতীয় দৌর্ব্বল্যের একটী প্রবল কারণ বিদূরিত এবং "মা লক্ষ্মী" অন্নের অপব্যয় না করিতে শিক্ষা করিতে পারি, তাহা কি বাঞ্ছনীয় নহে?

এস্থলে আমরা একটী কথা বলি। যদি কেহ "ভাতের ফেন-গালা কর্ত্তব্য" এতদ্বিষয়ক একটী প্রবন্ধ নানা প্রমাণপ্রয়োগ সহকারে লিখিয়া "ভাতের ফেন গালা অকর্ত্তব্য" ইত্যাদি মতের অসংশয়িত রূপে খণ্ডন করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি দেশের একটী মহোপকার সাধন করেন সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহার

প্রবন্ধ সাদরে গ্রহণ করিব এবং তাঁহাকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিব।

এক্ষণে, অন্নের ফেন গালিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, অথবা উহা গো জাতির খাদ্য হইয়া থাকে। কিন্তু পাঠকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, উহাতে অনেক কার্য্য হইতে পারে। দাল, ঝোল, দালনা প্রভৃতি তরকারি কেবল জলে সিদ্ধ না করিয়া ফেন মিশ্রিত জলে রন্ধন করিলে অধিকতর সুস্বাদ ও পুষ্টিকর হইয়া থাকে। অন্নপ্রাশন, বিবাহ, উপনয়ন প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডের সময় যদি অধিক লোক নিমন্ত্রিত হয়, আর যদি তাঁহাদের ভোজন সময়ে দালের অকুলান পড়ে, তবে অকুলান পরিহারার্থ দালের সহিত কাঁচা জল মিশ্রিত না করিয়া ফেন মিশ্রিত করিলে স্বাদের কোনও বৈলক্ষণ্য হয় না, অনেকে বোধ হয় অবগত আছেন। শাস্ত্রে কথিত আছে "কিং কপর্দ্দকো দরিদ্রতি" যে একটী কপর্দ্দককেও সামান্য বলিয়া অবজ্ঞা করে, সে দরিদ্র হয়। আমাদের এই দারিদ্র্যপ্রপাড়িত দেশে যে ফেনের ন্যায় সুন্দর সামগ্রীর অহরহঃ অপব্যয় হয়, ইহা ভাবিলেও ব্যথিত হইতে হয়।

শ্রীপুর,
১৩০১। ২২ শে আষাঢ়।

প্রকাশক
শ্রীপূর্ণ চন্দ্র মিত্র মুস্তৌফী
শ্রীঅতুল চন্দ্র মিত্র মুস্তৌফী
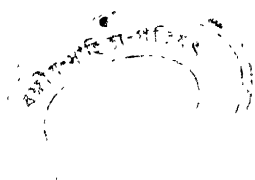
ভাতের ফেন গালা অকর্ত্তব্য, তজ্জন্য এদেশবাসীগণ হীনবল ও নির্দ্ধন হইতেছে।

"অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে জীবন্তি চ ন সংশয়ঃ।"

বঙ্গের বড়ই দুর্দ্দিন উপস্থিত। অনধিক পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে, আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। পূর্ব্বে আহার্য্য সামগ্রীর যেরূপ মূল্য ছিল, অধুনা তাহার চতুর্গুণ, পঞ্চগুণ বা তদধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির সহিত পরিশ্রমের মূল্যও বর্দ্ধিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু পরিশ্রমের মূল্য যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, দ্রব্যের মূল্য তদপেক্ষা অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আজকাল দেশ মধ্যে যেরূপ নিত্যই অন্নকষ্ট, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। পূর্ব্বে দুগ্ধ ঘৃত ইত্যাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ও অকৃত্রিম অবস্থায় পাওয়া যাইত, কিন্তু এক্ষণে বিশুদ্ধ দুগ্ধ ঘৃতাদি অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। মৎস্যও আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব বঙ্গবাসীর প্রধান আহার্য্য সামগ্রী গুলির অত্যন্ত অভাব ও বিকার ঘটিয়াছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আমাদের দেশের সাধারণ লোকের অবস্থা আজকাল এমনই শোচনীয় হইয়াছে যে, দুগ্ধ, ঘৃত, মৎস্য

ইত্যাদি আহার দূরে যাউক, কেবল মাত্র শাকান্নও অনেকে উদর পূরণ করিয়া আহার করিতে পায় না। এই অন্নকষ্টের সময় কতশত লোক অনশনে, কতশত লোক অর্দ্ধাশনে দিন যাপন করিতেছে, তাহার সংখ্যা হয় না। যাহারা উদর পূরণ করিয়া আহার করিতে পায়, তাহাদের মধ্যেও অধিকাংশ লোক যেরূপ উপকরণে উদর পূরণ করে, তাহাতে শরীরের সম্পূর্ণ পোষণ কিছুতেই সম্ভবে না। এই দুর্দ্দিনে সমাজমধ্যে একটী কুপ্রথা প্রচলিত থাকায়, অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে দেশের যে কিরূপ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় অন্নের ফেননিঃসারণই এই কুপ্রথা। অন্নের ফেন নিঃসারণ বহুকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইহা দ্বারা যেরূপ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, পূর্ব্বে সেরূপ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। আমরা এই প্রবন্ধে অন্নের ফেন নিঃসারণের অপকারিতা আলোচনা করিব; অর্থাৎ ফেন নিঃসারণ কিজন্য অনিষ্টকারী, ফেননিঃসারিত অন্ন ভোজন করিয়া বঙ্গবাসী কিরূপে অলক্ষিত ভাবে দিন দিন হীনবীর্য্য হইতেছে, এবং এই ফেননিঃসারণ প্রথা যে বঙ্গবাসীর দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ, ইহাই আমরা যথাক্রমে প্রতিপন্ন করিব। বিষয়টী অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া কেহ কেহ উপেক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে বিষয়টী কখনই সামান্য বলিয়া প্রতীত হইবে না।

জগৎপাতা জগদীশ্বর, আমাদের শরীর রক্ষণের জন্য যে কত প্রকার আহার্য্য দ্রব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা

অসাধ্য। তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দ্রব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্টিকৌশল পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি যে স্থানের যেরূপ জল বায়ু করিয়াছেন, সেই স্থানে তদনুরূপ প্রচুর আহার্য্য দ্রব্যের ও সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব যে দেশে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, সেই দ্রব্য সেই দেশের জল বায়ুর সম্যক উপযোগী এবং তত্রস্থ লোকের পক্ষে অধিকতর হিতকারী। দেশের শীতোষ্ণতার ন্যূনাধিক্য এবং অধিবাসীর প্রকৃতি অনুসারেও আহার্য্য দ্রব্য ব্যবহৃত হওয়া কর্ত্তব্য। মদ্য, মাংস প্রভৃতি অতি উগ্র, বলকারী ও উত্তেজক পদার্থগুলি শীত-প্রধানদেশবাসীগণের পক্ষে হিতকারী। কিন্তু ঐ সমুদায় দ্রব্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশে নিত্য ব্যবহার করিলে অনেক সময় অপকার হইতেই দেখা যায়। এক ভারতবর্ষেরই স্থান ভেদে জলবায়ু ও শীতোষ্ণতার তারতম্য বশতঃ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসীগণের পক্ষে দাল ও রুটী অতি হিতকারী, কিন্তু বঙ্গদেশে উহা নিত্য দুই বেলা আহার করিলে সহ্য হয় না; কারণ, উত্তর পশ্চিমা-ঞ্চলের জল বায়ু এরূপ গুণবিশিষ্ট যে সেখানে দাল রুটী সহজেই পরিপাক হয়, কিন্তু আমাদের দেশে উহা পরিপাক করা তাদৃশ সহজ নহে। বঙ্গদেশে তণ্ডুলই যথেষ্ট উৎপন্ন হয়, এবং এদেশের যেরূপ জল বায়ু ও এদেশবাসীর যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে অন্নই উপাদেয় হিতকর আহার। অন্যান্য দ্রব্য যথা দাল, তরকারী, মৎস্য, দুগ্ধ ইত্যাদি অন্নের সহিত মিলিত হইয়া শরীর রক্ষণে সহায়তা করে। অন্ন অপেক্ষা পুষ্টিকর ও বলকারী অনেক দ্রব্য আছে, কিন্তু ইহার তুল্য স্নিগ্ধ, লঘু অথচ পুষ্টিকর আহার্য্য

ইত্যাদি আহার দূরে যাউক, কেবল মাত্র শাকান্নও অনেকে উদর পূরণ করিয়া আহার করিতে পায় না। এই অন্নকষ্টের সময় কতশত লোক অনশনে, কতশত লোক অর্দ্ধাশনে দিন যাপন করিতেছে, তাহার সংখ্যা হয় না। যাহারা উদর পূরণ করিয়া আহার করিতে পায়, তাহাদের মধ্যেও অধিকাংশ লোক যেরূপ উপকরণে উদর পূরণ করে, তাহাতে শরীরের সম্পূর্ণ পোষণ কিছুতেই সম্ভবে না। এই দুর্দ্দিনে সমাজমধ্যে একটী কুপ্রথা প্রচলিত থাকায়, অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে দেশের যে কিরূপ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় অন্নের ফেননিঃসারণই এই কুপ্রথা। অন্নের ফেন নিঃসারণ বহুকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইহা দ্বারা যেরূপ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, পূর্ব্বে সেরূপ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। আমরা এই প্রবন্ধে অন্নের ফেন নিঃসারণের অপকারিতা আলোচনা করিব; অর্থাৎ ফেন নিঃসারণ কিজন্য অনিষ্টকারী, ফেননিঃসারিত অন্ন ভোজন করিয়া বঙ্গবাসী কিরূপে অলক্ষিত ভাবে দিন দিন হীনবীর্য্য হইতেছে, এবং এই ফেননিঃসারণ প্রথা যে বঙ্গবাসীর দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ, ইহাই আমরা যথাক্রমে প্রতিপন্ন করিব। বিষয়টী অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া কেহ কেহ উপেক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে বিষয়টী কখনই সামান্য বলিয়া প্রতীত হইবে না।

জগৎপাতা জগদীশ্বর, আমাদের শরীর রক্ষণের জন্য যে কত প্রকার আহার্য্য দ্রব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা

অসাধ্য। তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দ্রব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্টিকৌশল পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি যে স্থানের যেরূপ জল বায়ু করিয়াছেন, সেই স্থানে তদনুরূপ প্রচুর আহার্য্য দ্রব্যের ও সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব যে দেশে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, সেই দ্রব্য সেই দেশের জল বায়ুর সম্যক উপযোগী এবং তত্রস্থ লোকের পক্ষে অধিকতর হিতকারী। দেশের শীতোষ্ণতার ন্যূনাধিক্য এবং অধিবাসীর প্রকৃতি অনুসারেও আহার্য্য দ্রব্য ব্যবহৃত হওয়া কর্ত্তব্য। মদ্য, মাংস প্রভৃতি অতি উগ্র, বলকারী ও উত্তেজক পদার্থগুলি শীত-প্রধানদেশবাসীগণের পক্ষে হিতকারী। কিন্তু ঐ সমুদায় দ্রব্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশে নিত্য ব্যবহার করিলে অনেক সময় অপকার হইতেই দেখা যায়। এক ভারতবর্ষেরই স্থান ভেদে জলবায়ু ও শীতোষ্ণতার তারতম্য বশতঃ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসীগণের পক্ষে দাল ও রুটী অতি হিতকারী, কিন্তু বঙ্গদেশে উহা নিত্য দুই বেলা আহার করিলে সহ্য হয় না; কারণ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জল বায়ু এরূপ গুণবিশিষ্ট যে সেখানে দাল রুটী সহজেই পরিপাক হয়, কিন্তু আমাদের দেশে উহা পরিপাক করা তাদৃশ সহজ নহে। বঙ্গদেশে তণ্ডুলই যথেষ্ট উৎপন্ন হয়, এবং এদেশের যেরূপ জল বায়ু ও এদেশবাসীর যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে অন্নই উপাদেয় হিতকর আহার। অন্যান্য দ্রব্য যথা দাল, তরকারী, মৎস্য, দুগ্ধ ইত্যাদি অন্নের সহিত মিলিত হইয়া শরীর রক্ষণে সহায়তা করে। অন্ন অপেক্ষা পুষ্টিকর ও বলকারী অনেক দ্রব্য আছে, কিন্তু ইহার তুল্য স্নিগ্ধ, লঘু অথচ পুষ্টিকর আহার্য্য

অতি বিরল। সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ ভাবপ্রকাশে শালি ধান্যের এইরূপ গুণ বর্ণিত আছে, যথা :—

"শালয়ো মধুরাঃ স্নিগ্ধা বল্যা বদ্ধাল্পবর্চ্চসঃ।

কষায়া লঘবো রুচ্যাঃ স্বর্য্যা বৃষ্যাশ্চ বৃংহণাঃ ॥"

অর্থাৎ, শালিধান্য মধুর, স্নিগ্ধ, বলকারক, অল্পকোষ্ঠবদ্ধকারী, কষায়, লঘু, রুচিকর, স্বরের উৎকর্ষজনক, শুক্রবর্দ্ধক এবং পুষ্টিকারী। উল্লিখিত গ্রন্থে অন্নের গুণ সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—

"ভক্তং বহ্নিকরং পথ্যং তর্পণং রোচনং লঘু।"

অর্থাৎ, অন্ন অগ্নিবর্দ্ধক, হিতকারী, তৃপ্তিজনক, রোচক ও লঘু। অন্যত্র :—

"সৌমনস্যং বলম্পুষ্টিমুৎসাহং রসনাসুখং।

স্বাদু সঞ্জনয়ত্যন্নং . . . . ॥"

স্বাদু অন্ন ভোজন করিলে প্রসন্নতা, বল, পুষ্টি, রসনাসুখ ও উৎসাহ জন্মে। ফলতঃ, আমাদের দেশের যেরূপ জলবায়ু, তাহাতে এইরূপ স্নিগ্ধ, লঘু ও পুষ্টিকর খাদ্যই উপযোগী; এই জন্যই প্রাচীন কাল হইতে আমাদের দেশে অন্নাহার চলিয়া আসিতেছে। অন্নই এদেশবাসীগণের প্রধান হিতকারী আহার।

ডাক্তার এড্মাণ্ড এ পার্কস্ সাহেব তৎপ্রণীত "স্বাস্থ্যরক্ষা" গ্রন্থে তণ্ডুলের বিষয় যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহার অনুবাদ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। "তণ্ডুলে অতি সুপাচ্য শ্বেতসার বর্ত্তমান থাকায়, ইহা একটী হিতকারী খাদ্য, এবং এই জাতীয় অন্যান্য দ্রব্যের (গোধুম যব ইত্যাদির) ন্যায় ইহাতে অনেক গুলি

উপাদান মিশ্রিত আছে। কিন্তু গোধূম অপেক্ষা ইহাতে অল্প পরিমাণে যবক্ষারজানময় পদার্থ আছে, এবং তৈলময় পদার্থ ইহাতে আরও অল্প পরিমাণে বিদ্যমান আছে। এই জন্য অন্ন-ভোজী জাতি সমূহের মধ্যে, প্রথমোক্ত অভাব (যবক্ষারজানের অল্পতা) পূরণের জন্য দ্বিদল, ও শেষোক্ত অভাব (তৈলময় পদার্থের অল্পতা) পূরণের জন্য জান্তব কিম্বা ঔদ্ভিদ তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তণ্ডুলে লবণের পরিমাণও অতি অল্প।"*

ডাক্তার এইচ্, কিং সাহেব তৎকৃত "স্বাস্থ্যরক্ষা" গ্রন্থে তণ্ডুলের বিষয় এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

"তণ্ডুল একটী মূল্যবান্ খাদ্য, কারণ, ইহাতে প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসার আছে, এবং ইহা যবক্ষারজানময় ও লবণময় পদার্থ-শূন্যও নহে; ইহা সহজে রন্ধন করা যায়, এবং পরিপাক করাও সহজ। ইহাতে যবক্ষারজানময় পদার্থ অল্প পরিমাণে বিদ্যমান, এবং এই বিষয়ে ইহা এই জাতীয় অন্যান্য দ্রব্য (গোধূম, যব ইত্যাদি) অপেক্ষা নিকৃষ্ট; এনিমিত্ত, উক্ত অভাব পূরণের জন্য উহার সহিত মাংস, মৎস্য, দাল, দুগ্ধ কিম্বা তক্র এরূপ একটী খাদ্যের সংযোগ আবশ্যক। ইহাতে তৈলময় পদার্থও অতি অল্প পরিমাণে আছে, সুতরাং উহার সহিত নবনীত, ঘৃত কিম্বা অন্য তৈলাক্ত দ্রব্য ব্যবহার করা আবশ্যক। লবণও ইহাতে অল্প

* A Manual of Practical Hygiene, by Edmund A. Parkes M. D. F. R. S. eighth edit ion. Page 306.

পরিমাণে আছে, সুতরাং অন্য খাদ্য দ্বারা উক্ত অভাব পূরণ করা কর্ত্তব্য।”*

এক্ষণে উল্লিখিত উপাদান তণ্ডুলে কি পরিমাণে আছে, দেখা যাউক। লেথ্‌বি সাহেব পরীক্ষা দ্বারা তণ্ডুলের উপাদান ও তাহার পরিমাণ এইরূপ স্থির করিয়াছেন :—

যবক্ষারজানময়	শতাংশের মধ্যে	৬.৩
শ্বেতসার ও শর্করাময়	,,	৭৯.৫
তৈলময়	,,	.৭
লবণময়	,,	.৫
জল	,,	১৩.০

যদি তণ্ডুলে যবক্ষারজানময় পদার্থের অংশ গড়ে ৬.৩ ধরা যায়, তাহা হইলে, এক পাউণ্ড তণ্ডুলে যবক্ষারজানময় ৪৪১ গ্রেণ্, শ্বেতসার ৫৪৩৭ গ্রেণ্, তৈলময় পদার্থ ৪৯ গ্রেণ্, শর্করা ২৮ গ্রেণ্ এবং লবণময় পদার্থ ৩৫ গ্রেণ্ আছে।

অতঃপর, এই সমুদায় উপাদানের মধ্যে কোনটীর কি প্রকার গুণ, অর্থাৎ কোনটীর দ্বারা শরীরের কিরূপ কার্য্য হইয়া থাকে, তাহা জানা আবশ্যক।

যবক্ষারজানময় পদার্থ হইতে শরীরের দুই প্রকার উপকার হয়। (১ম) উপধাতুবিশিষ্ট দৈহিকযন্ত্রের পুষ্টিসাধন ও জীর্ণ-

* The Madras Manual of Hygiene,
by Surgeon,major H. King M. A. M. B., chr. L.
Second edition. Page 149.

সংস্কার (অর্থাৎ, আমাদের শরীরের যে প্রতিনিয়তই ক্ষয় হইতেছে তাহার পূরণ), (২য়) তেজ উৎপাদন।• ঐ তেজ পেশী ও স্নায়ু-মণ্ডলীর কার্য্যে এবং উত্তাপরূপে পরিণত হয়।

শ্বেতসারময় পদার্থ শরীর পরিপোষণের জন্য বিশেষ আবশ্যক, এবং ইহাদ্বারা তেজ ও দৈহিক উত্তাপ উৎপন্ন হয়।

তৈলময় পদার্থ শরীরস্থ তৈলময় পদার্থের জীর্ণসংস্কারে ব্যবহৃত হয়, এবং তেজ ও দৈহিক উত্তাপ উৎপাদন করে।

এই তিন প্রকার পদার্থ ভিন্ন আর এক প্রকার পদার্থ শরীর রক্ষণে আবশ্যক; ইহা, ধাতব ও উপধাতব মিশ্রিত পদার্থ, এই নামে অভিহিত। জল ও লবণ এই শ্রেণীভুক্ত। জলই প্রধান উপধাতব পদার্থ; জীবনধারণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার্থে জল অতীব প্রয়োজনীয়। জল শোণিতকে যথোপযুক্তরূপে তরল রাখে ও শরীরের সমস্ত স্থানে পরিভ্রমণ করিবার উপযুক্ত এবং যন্ত্র সকলকে যথোচিত সিক্ত ও কার্য্যক্ষম করে। লবণও প্রাণধারণের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় পদার্থ; লবণ ব্যবহার হেতু দৈহিক ক্রিয়া সমুদায় শীঘ্র শীঘ্র হইয়া থাকে এবং ইহা দ্বারা অস্থির ক্ষয় পূরণ হয়। যে খাদ্যে লবণের অংশ অল্প, তাহা অধিক কাল ব্যবহার করিলে, পীড়া উপস্থিত হইতে পারে।

যে চারি প্রকার পদার্থের বিষয় বলা হইল, অর্থাৎ, (১ম) যবক্ষারজানময়, (২য়) শ্বেতসারময়, (৩য়) তৈলময়, ও (৪র্থ) ধাতব ও উপধাতব মিশ্রিত পদার্থ, এই কয়েকটীই মনুষ্যের খাদ্যে থাকা আবশ্যক। এই চারিটী পদার্থের মধ্যে কোন একটীর অভাবে স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে পারে না, ইহা শরীর তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ নানা-

প্রকার পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সৌভাগ্য বশতঃ, আমাদের অন্নে এই চারিটী উপাদানই বর্ত্তমান; বোধ হয়, এই জন্যই ডাক্তার কিং সাহেব তণ্ডুলকে "বহুমূল্য খাদ্য" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

তণ্ডুলে কি কি উপাদান কি পরিমাণে বর্ত্তমান, এবং প্রত্যেকের দ্বারা শরীরের কি কি কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা আমরা উল্লেখ করিয়াছি; এক্ষণে, তণ্ডুল হইতে অন্ন পাকের প্রণালী পর্য্যালোচনা করিব; কারণ, পাকের প্রণালীভেদে খাদ্যের গুণের ও পুষ্টিকারিতার তারতম্য হইয়া থাকে। কিন্তু অন্নপাক প্রণালী পর্য্যালোচনা করিবার পূর্ব্বে, তণ্ডুল কি প্রণালীতে প্রস্তুত হয়, তাহা আলোচনা করা আবশ্যক। তণ্ডুল দ্বিবিধ—সিদ্ধ ও আতপ। ধান্য অগ্নির উত্তাপে জলে কিঞ্চিৎ সিদ্ধ করিয়া শুষ্ক করতঃ যে তণ্ডুল প্রস্তুত হয়, উহার নাম সিদ্ধ তণ্ডুল, এবং কেবল সূর্য্য কিরণে (আতপ) শুষ্ক করিয়া যে তণ্ডুল প্রস্তুত হয়, তাহাকে আতপ তণ্ডুল কহে। সিদ্ধ তণ্ডুল অপেক্ষা আতপ তণ্ডুল অধিকতর পুষ্টিকর, কারণ, সিদ্ধতণ্ডুল প্রস্তুত করিতে, তণ্ডুলের উপাদানগুলি তপ্ত জলের সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে নির্গত হইয়া যায়। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি আতপতণ্ডুল সিদ্ধতণ্ডুল অপেক্ষা অধিকতর পুষ্টিকর হইল, তাহা হইলে, এদেশে সিদ্ধতণ্ডুল সাধারণতঃ প্রচলিত হওয়ার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, আতপ তণ্ডুল প্রস্তুত করিতে অধিকতর পরিশ্রম করিতে হয়, এবং উহা অপেক্ষাকৃত মহার্ঘ, কিন্তু সিদ্ধতণ্ডুল অল্পায়াসসাধ্য ও সুলভ। এই জন্য, আতপতণ্ডুল অধিকতর পুষ্টিকর হইলেও

সিদ্ধতণ্ডুলই এক্ষণে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রাচীন কালে আতপ তণ্ডুলই প্রচলিত ছিল, যেহেতু, যাগ, যজ্ঞ, দেবার্চ্চনা, শ্রাদ্ধাদি হিন্দুর করণীয় প্রত্যেক কার্য্যে আতপ তণ্ডুলের নৈবেদ্য পিণ্ড প্রভৃতির ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়, কিন্তু সিদ্ধ তণ্ডুলের উল্লেখ কোন স্থলে দেখা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ও হিন্দু বিধবা গণ আতপ তণ্ডুলের অন্ন আহার করিয়া থাকেন, এবং হবিষ্য-ভোজনেও আতপ তণ্ডুল ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহা ঐ প্রাচীন প্রথারই পরিচায়ক মাত্র। সিদ্ধতণ্ডুলের প্রচলন আধুনিক বলিয়া অনুমিত হয়, তবে কোন্ সময় হইতে ইহার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। যাহা হউক, এই দ্বিবিধ তণ্ডুল হইতে বর্ত্তমান সময়ে এদেশে অন্ন পাকের যে প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহার আলোচনা করা যাউক। আতপ ও সিদ্ধ তণ্ডুল উভয়ই অগ্ন্যুত্তাপে জলে সিদ্ধ হইয়া পক্ক হয়; তন্মধ্যে, আতপতণ্ডুলপাকে অধিকাংশ স্থলে, বিশেষতঃ হবিষ্য ভোজনে ফেন নির্গত করা হয় না, কিন্তু সিদ্ধতণ্ডুল পাকে প্রায় সর্ব্বত্রই ফেন নিঃসৃত করিতে দেখা যায়। এক্ষণে, এই ফেন নিঃসারণ প্রথা কতদূর যুক্তিসঙ্গত ও হিতকারী, ইহাই আমাদের বিচার্য্য। ইহা বিচার করিতে হইলে, ফেনের সহিত তণ্ডুলের কি কি উপাদান নির্গত হয়, তাহা দেখা আবশ্যক।

প্রথমতঃ, ইহার শ্বেতসার নির্গত হইয়া যায়। সিভিল সার্জ্জন্, শ্রীযুক্ত ধর্ম্ম দাস বসু মহাশয় তৎপ্রণীত "স্বাস্থ্যরক্ষা ও সাধারণ স্বাস্থ্যতত্ত্ব" গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—"পরীক্ষা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে, একসের চাউল সিদ্ধ করিলে প্রায় তিন সের মাড়

জন্মে, ও প্রতিসের মাড়ে প্রায় ৪০০ হইতে ৮০০ গ্রেণ্ পর্য্যন্ত শ্বেত-সার পদার্থ থাকে ; সুতরাং তিন সের মাড়ে (গড়ে সের প্রতি ৬০০ গ্রেণ্) প্রায় ১৮০০ গ্রেণ্ অর্থাৎ দুই ছটাক অপেক্ষা অধিক শ্বেত-সার থাকে ; অতএব এক সের চাউল পাক করিলে কেবল চৌদ্দ ছটাক চাউলের ভাত উৎপন্ন হয়, এবং যে পরিমাণে চাউল সিদ্ধ করা যায়, তাহার আট অংশের এক অংশ পরিত্যক্ত হয়।" *

দ্বিতীয়তঃ, ফেনের সহিত যবক্ষারজানময় পদার্থ নিঃসৃত হয়। ডাক্তার পার্কস্ সাহেব তাঁহার "স্বাস্থ্যরক্ষা" গ্রন্থে এইরূপ বলিয়াছেন :—" তণ্ডুল অধিক তাপে সিদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে, মন্দ মন্দ উত্তাপে ধীরে ধীরে সিদ্ধ করা কর্ত্তব্য, নতুবা অতিশয় উত্তাপে অধিকক্ষণ সিদ্ধ করিলে, ফেনের সহিত যবক্ষারজান নিঃসৃত হওয়ায় তণ্ডুলের পুষ্টিকারিতাশক্তি নষ্ট হয়।"† অতএব,

* ফেনের সহিত শ্বেতসার নির্গত হয়, ইহা নিম্ন লিখিত রূপে পরীক্ষা করা যাইতে পারে। কিঞ্চিৎ ফেনের মধ্যে অল্প টিংচার্ আয়োডিন্ (Tincture Iodin) নিক্ষেপ করিলে, আয়োডিনের ভায়োলেট্ (Violet) বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া সমস্ত ফেন তৎক্ষণাৎ গাঢ় নীলবর্ণ ধারণকরে। ফেনে শ্বেতসার বর্ত্তমান থাকাই ঐরূপ বর্ণ পরিবর্ত্তনের কারণ। শ্বেতসারের সহিত আয়োডিন্ মিশ্রিত করিলে, উভয়ের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গাঢ় নীলবর্ণ হয়, ইহা রাসায়নিক তত্ত্ব।

† "It (rice) should properly be steamed, not boiled, * * * If boiled, it should not be for too long a time, otherwise the rice water contains some albuminous matter, and the grain loses in nutritive power."

Hygiene by Edmund A. Parkes M. D. F. R. S.
PAGE 306

আমাদের দেশে এক্ষণে যে প্রণালীতে সাধারণতঃ অন্নপাক হইয়া থাকে, তাহাতে ফেনের সহিত যবক্ষারজান নিঃসৃত হয়, ইহা পার্কস সাহেবের কথা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে।

তৃতীয়তঃ, ফেনের সহিত তণ্ডুলের তৈলময় ও লবণময় পদার্থ নিঃসৃত হয় কি না, ইহার নিশ্চিত প্রমাণ আমরা পাই নাই ; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, শ্বেতসার ও যবক্ষারজানের ন্যায় এই দুইটী উপাদানও ফেনের সহিত নিঃসৃত হইয়া যায়।

আমারা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মনুষ্যের খাদ্যে যবক্ষারজানময়, শ্বেতসারময়, তৈলময় এবং ধাতব ও উপধাতব মিশ্রিত পদার্থ এই চারি প্রকার সামগ্রীই থাকা আবশ্যক, এবং ইহাদের মধ্যে কোন একটীর অভাবে স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে পারে না। অতএব ফেনের সহিত ঐ সমুদায় উপাদান পরিত্যাগ করা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। তণ্ডুলে শ্বেতসার অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান, সুতরাং উহার কিয়দংশ পরিত্যাগ করিলে বিশেষ অনিষ্ট না হইতে পারে; কিন্তু ইহাতে যবক্ষারজানের পরিমাণ অল্প, সুতরাং ফেনের সহিত উহার কোন অংশ পরিত্যক্ত হইলে, অন্নের পুষ্টিকারিতার অত্যন্ত অভাব ঘটে। শরীররক্ষণে যে চারিটী সামগ্রীর আবশ্যক, তন্মধ্যে যবক্ষারজান সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ; অতএব যাহাতে উক্ত উপাদান অন্ন হইতে কিছু-মাত্র নির্গত হইয়া না যায়, এরূপ প্রণালীতে অন্নপাক করা কর্ত্তব্য। ফেনের সহিত যবক্ষারজান নির্গত হইয়া গেলে, উহার অভাব দুগ্ধ, মৎস্য প্রভৃতি যবক্ষারজানবিশিষ্ট খাদ্যদ্বারা কথঞ্চিৎ পূরণ হইতে পারে, কিন্তু এদেশে অতি অল্পলোকের ভাগ্যেই

পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ ইত্যাদি আহার ঘটিয়া থাকে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকে শাকান্ন ভিন্ন আর কিছুই আহার করিতে পায় না, আবার অনেকে এই শাকান্নও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং ইহাদের পক্ষে উক্ত অভাব পূরণ হইবার কোনও উপায় নাই। অতএব যাঁহারা অন্নের সহিত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ, মৎস্য ইত্যাদি আহার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে অন্নের ফেননিঃসারণ বিশেষ ক্ষতিকর না হইতেও পারে, কিন্তু দেশের সাধারণ লোকের পক্ষে ইহা অতীব অনিষ্টকর।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, এদেশে এক্ষণে সিদ্ধতণ্ডুলই সাধারণতঃ প্রচলিত; কিন্তু প্রথমতঃ ঐ তণ্ডুল প্রস্তুত করণেই তপ্ত জলের সহিত উহার উপাদান কিয়ৎপরিমাণে নির্গত হইয়া যায়; পুনরায়, অন্নপাক কালে ফেনের সহিত ঐ উপাদান গুলি পরিত্যক্ত হওয়ায়, উক্ত অন্নের পুষ্টিকারিতা অনেকাংশে হ্রস্ব হইয়া পড়ে। ফলতঃ, ফেনের সহিত যে পরিমাণে উক্ত উপাদানগুলি নির্গত হয়, ঠিক সেই পরিমাণে অন্নের পুষ্টিকারিতার হ্রাস হইয়া থাকে। সুতরাং এরূপ অন্ন স্বাস্থ্যরক্ষণে কখনই সম্পূর্ণ উপযোগী হইতে পারে না। যিনি, আতপতণ্ডুল সিদ্ধতণ্ডুল অপেক্ষা পুষ্টিকর ও হিতকারী বলিয়া স্বীকার করেন, তিনিই অন্নের ফেননিঃসারণের অন্যায্যতা স্বীকার করিবেন; কারণ, যে কারণে আতপতণ্ডুল সিদ্ধতণ্ডুল অপেক্ষা পুষ্টিকর ও হিতকারী, ঠিক সেই কারণে ফেনযুক্ত অন্ন ফেননিঃসারিত অন্ন অপেক্ষা পুষ্টিকর ও উপকারী। হবিষ্য ভোজনে ফেন পরিত্যক্ত হয় না, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, হবিষ্যাশী ব্যক্তি একাহারী, সুতরাং তাহার শরীররক্ষণে বিশেষ পুষ্টিকর

আহারের প্রয়োজন, কিন্তু অন্নের ফেন নির্গত করিলে উহার পুষ্টিকারিতার হ্রাস হয় বলিয়া, ঐ অন্ন একাহারী ব্যক্তির শরীর-রক্ষণে কখনই উপযোগী হইতে পারে না।

কেবল ফেনপান করিয়া সুস্থশরীরে কিছুকাল জীবনধারণ করা যায়, ইতিহাসে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্লাইব আর্কটনগরের দুর্গ অধিকার করিলে, যখন বিপক্ষসেনা উক্ত দুর্গ অবরোধ করে, সেই সময়ে ক্লাইবের পক্ষীয় সেনাগণকে আহারাভাবে অতিশয় কষ্ট পাইতে হয়। পঞ্চাশ দিন যাবৎ এই দুর্গ অবরুদ্ধ ছিল। মেকলে সাহেব তৎপ্রণীত "এসেস্" (Essays) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, এই অন্নকষ্টের সময় ক্লাইবের পক্ষীয় সিপাহী সৈন্যেরা কেবল ফেনপান এবং ইউরোপীয় সেনারা অন্ন-আহার করিত। ফেনের পুষ্টিকারিতা না থাকিলে, সিপাহীরা কেবল ফেনপান করিয়া এত দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিতে কখনই সমর্থ হইত না।

ফেন খাইয়া সুস্থশরীরে কিছুকাল জীবনধারণ করা যায়, ইহা প্রাচীন ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমার এক আত্মীয়ের মুখে শুনিয়াছি, ১২৬৯ সালে নদীয়া অঞ্চলে দারুণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। ঐ সময়ে একটী অনাথা স্ত্রীলোক স্বীয় উদরান্ন সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়া প্রতিদিন তাঁহার বাটীর অন্তঃপুরে আসিয়া পরিত্যক্ত ফেন কিঞ্চিৎ লবণমিশ্রিত করিয়া খাইয়া যাইত। প্রায় তিন মাস কাল ঐ স্ত্রীলোকটী কেবল এই ফেন খাইয়া বেশ সুস্থ ও সবল ছিল।

অনেকে বোধ হয় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, দরিদ্রলোকদের মধ্যে যাহারা দুগ্ধ ক্রয় করিতে অসমর্থ, তাহারা তাহাদের শিশু সন্তান দিগকে মাতৃদুগ্ধ অভাবে ভাতের ফেন খাওয়াইয়া থাকে। কেবল ফেন খাইয়াই তাহাদিগকে অনেক সময় বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়।

অতএব ভাতের ফেন অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং উহা পরিত্যাগ করা অতীব অকর্ত্তব্য, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

কিন্তু ফেনযুক্ত অন্নভোজনে অনেকে আপত্তি করিয়া থাকেন, সুতরাং ভাতের ফেন গালা যে অন্যায়, তাহা সম্পূর্ণরূপ প্রতিপন্ন করিতে হইলে, ইহার মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ফেনযুক্ত অন্ন কিঞ্চিৎ গুরু, সুতরাং হিতকারী নহে। বাস্তবিক, ফেনযুক্ত অন্ন ফেননিঃসারিত অন্ন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ গুরু; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে পুষ্টিকর ও বলকারী দ্রব্যমাত্রেই ন্যূনাধিক গুরুগুণবিশিষ্ট। ফেনযুক্ত অন্ন গুরু হইলেও রুটী অপেক্ষা লঘু তাহাতে সন্দেহ নাই, অতএব ফেনযুক্ত অন্নের গুরুত্ব সুস্থদেহীর পক্ষে কখনই অপকারী হইতে পারে না, বরং উক্ত অন্ন অধিকতর পুষ্টিকর বলিয়া শরীররক্ষণে সমধিক উপযোগী। পীড়িত দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে ফেণনিঃসারিত অন্ন হিতকারী হইতে পারে, কিন্তু সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে ফেনযুক্ত অন্নই উপকারী। পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে সাগু হিতকারী পথ্য, কিন্তু নীরোগ ব্যক্তি যদি লঘুপাক বলিয়া নিত্য সাগু আহার করে, তাহা হইলে, তাহার শরীর দিন দিন দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইতে থাকে। সেইরূপ, ফেনক্ত অন্ন রোগবিশেষে হিতকারী না হইলেও,

সুস্থকায় ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী ও হিতকারী তাহাতে সন্দেহ নাই। "রোগবিশেষে" বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সর্ব্ব-প্রকার রোগেই যে ফেনযুক্ত অন্ন অব্যবস্থেয় তাহাও নহে, কারণ দ্রব্যগুণবিৎ বিজ্ঞ বৈদ্যগণকে অনেক সময়, উদরাময় ইত্যাদি রোগে "পোরের ভাতের"* ব্যবস্থা করিতে দেখা যায়। বলা নিষ্প্রয়োজন, এরূপ অন্নে ফেন অবশিষ্ট থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ, কেহ কেহ এরূপ বলেন যে, ফেনযুক্ত অন্নে জলীয় ভাগ অধিক থাকাতে আহারের অসুবিধা ও পরিপাকের কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হয়। তাঁহাদের এই আপত্তি অনায়াসেই খণ্ডিত হইতে পারে; যেহেতু, বর্ত্তমান সময়ে অন্নপাকের যে প্রণালী সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়, তাহা সমীচীন নহে। সচরাচর তণ্ডুল অধিকপরিমাণ জল দ্বারা প্রচণ্ড অগ্নির সন্তাপে সিদ্ধ করা হয়; কিন্তু আমাদের মতে এরূপ করা কর্ত্তব্য নহে। তণ্ডুল উত্তমরূপ ধৌত করতঃ উহার চতুর্গুণ হইতে পঞ্চগুণপরিমিত জল দ্বারা মন্দ মন্দ

---

*"পোরের ভাত প্রস্তুত প্রকরণ :—কতকগুলি ঘুঁটে উপর্য্যুপরি সজ্জিত করিয়া অগ্নিসংযোগ কর। অতঃপর, একটী মৃণ্ময় ভাণ্ডে তণ্ডুল ও তাহার চতুর্গুণ জল দিয়া, ভাণ্ডের মুখ সরা দ্বারা আবৃত করিয়া ঐ অগ্নিতে চাপাইয়া দাও। এই প্রণালীতে তণ্ডুল ধীরে ধীরে সিদ্ধ হইয়া যে অন্ন প্রস্তুত হয়, তাহাকে "পোরের ভাত" বলে। ইহাতে সুসিদ্ধ অন্ন প্রস্তুত হয় ও ফেন কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। উদরাময় রোগে এই অন্ন বিশেষ উপকারী।

অগ্নির সন্তাপে সিদ্ধ করিতে হয়, এবং ভাত ফুটিলে ক্রমশঃ অগ্নির সন্তাপ আরও মৃদু করিতে হয়; এইরূপ করিলে, ঐ জল সম্পূর্ণ রূপে শোষিত হইয়া সুসিদ্ধ অন্ন প্রস্তুত হয়, এবং ফেন অবশিষ্ট থাকেনা। ডাক্তার পার্কস্ ও ডাক্তার কিং সাহেব ইঁহারাও বলিয়াছেন যে, তণ্ডুল মন্দ মন্দ উত্তাপে ধীরে ধীরে সিদ্ধ করা কর্ত্তব্য *। লেখক স্বয়ং এক বৎসরের তণ্ডুল চতুর্গুণ জল দ্বারা মৃদু সন্তাপে পাক করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইহাতে সুসিদ্ধ অন্ন প্রস্তুত হয়, এবং ফেন কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। তণ্ডুল বিশেষে জলের পরিমাণ চতুর্গুণ হইতে পঞ্চগুণ আবশ্যক। সচরাচর নূতন তণ্ডুলে চতুর্গুণ ও পুরাতন তণ্ডুলে প্রায় পঞ্চগুণ জলের প্রয়োজন, কোন কোন নিকৃষ্ট কঠিন নূতন তণ্ডুলেও পঞ্চগুণ জল আবশ্যক হইতে পারে; এবং আতপ তণ্ডুল অপেক্ষা সিদ্ধ তণ্ডুল পাকে কিঞ্চিৎ অধিক জলের প্রয়োজন। অন্নপাক সম্বন্ধে ভাব প্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে :—

"সুধৌতান্ তণ্ডুলান্ স্ফীতান্ তোয়ে পঞ্চগুণে পচেৎ।
তদ্ভক্তং প্রস্তুতং চোষ্ণং বিশদং গুণবন্মতম্॥"

তণ্ডুল উত্তমরূপ ধৌত ও স্ফীত হইলে পাঁচগুণ জলে পাক করিতে হইবে; যখন সেই তণ্ডুল সিদ্ধ হইয়া আসিবে, তখনই

---

* Rice is prepared for food by slow boiling or steaming.

Hygiene by H. King M. A. M. B. ch. L.
Page 149

vide quotation from Dr. Parkes in page 10.

তাহাকে অন্ন বলা যায়; এবং এইরূপ প্রস্তুত অন্ন উষ্ণ থাকিতে থাকিতে বিশদ ও গুণকারী বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। চক্রদত্তও এইরূপ বলিয়াছেন:—

"অন্নং পঞ্চগুণে তোয়ে যবাগূং ষড়্‌গুণে পচেৎ"।

অর্থাৎ অন্ন পাঁচগুণ জলে ও যবাগূ ছয়গুণ জলে পাক করিবে।

অতএব উল্লিখিত নিয়মে অর্থাৎ পরিমিত জলে মৃদু সন্তাপে অন্ন পাক করিলে, সমস্ত জল শোষিত হওয়ায় ফেন অবশিষ্ট থাকে না, এবং অতি উপাদেয় সুসিদ্ধ অন্ন প্রস্তুত হয়। এইরূপে প্রস্তুত অন্নে জলীয় ভাগ অধিক থাকিবে না, সুতরাং পরিপাকের কোনরূপ ব্যাঘাত, কিংবা আহারে কিছুমাত্র অসুবিধা হইবে না। আমরা যে "ফেনযুক্তঅন্ন" বাক্যটী প্রবন্ধে ব্যবহার করিয়াছি, তদ্দ্বারা এইরূপে প্রস্তুত অন্নই বুঝিতে হইবে। কেহ যেন মনে না করেন, ইহার অর্থ, তরল ফেনমিশ্রিতঅন্ন। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, এদেশে এক্ষণে যে প্রণালীতে অন্নপাক হয়, তাহাতে ফেনের সহিত শ্বেতসারময়, যবক্ষারজানময়, তৈলময় ও লবণময় এই চারিটী জীবন ধারণের অত্যাবশ্যক পদার্থই অল্প বা অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া যায়; কিন্তু উল্লিখিতরূপে অন্ন প্রস্তুত করিলে সমস্ত উপাদান গুলিই রক্ষিত হয়, অথচ সুসিদ্ধ উপাদেয় অন্ন প্রস্তুত হয়। অতএব ফেনযুক্ত অন্নাহারই প্রশস্ত।

তৃতীয়তঃ, কেহ কেহ ফেনযুক্তঅন্ন কফপ্রদ বলিয়া থাকেন, কিন্তু এরূপ হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। ফেনমিশ্রিত ক্লিন্ন

অন্ন কফবর্দ্ধক হইতে পারে, কিন্তু যে নিয়মে অন্নপাকের বিষয় বলা হইল, ঐরূপ প্রস্তুত অন্ন কি প্রকারে কফবর্দ্ধক হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ফলতঃ, যিনি পূর্ব্বোল্লিখিত "পোরের ভাতের" গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি ফেনযুক্ত অন্ন অহিতকারী, কফবর্দ্ধক ইত্যাদি আপত্তি কখনই গ্রাহ্য করিবেন না।

চতুর্থতঃ, কেহ কেহ এরূপ বলিয়া থাকেন যে, এদেশবাসীগণের বল ও অগ্নি অনেকাংশে ক্ষীণ হইয়াছে, এ অবস্থায় ফেনযুক্ত অন্ন ব্যবহৃত হইতে পারে না। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ফেনযুক্ত অন্ন এরূপ গুরু নহে যে, পরিমিতরূপে আহার করিলে উপকারী না হইয়া অপকারী হইবে। লঘুদ্রব্যও অপরিমিত আহার করিলে অনেক সময় অপকারী হইয়া থাকে, সুতরাং অগ্নি ও বল অনুসারে পরিমিত আহার করিলে, ফেনযুক্ত অন্ন অধিকতর উপকারী হইবে সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে, ফেননিঃসারিত অপেক্ষাকৃত অপুষ্টিকর অন্ন ভোজন করিলে, বল ও অগ্ন্যাদি উত্তরোত্তর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইবারই সম্ভাবনা।

অতএব ফেনযুক্ত অন্নভোজনে যে সমুদায় আপত্তি উত্থাপিত হয়, তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ ও পাকপ্রণালীর অনভিজ্ঞতাসূচক।

অন্নপাক সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে ফেননিঃসারণের কোন উল্লেখ নাই; যদি ফেননিঃসারণ আবশ্যক ও হিতকারী হইত, তাহাহইলে উক্ত বচনদ্বয়ে ইহার উল্লেখ অবশ্যই থাকিত; অতএব এই বচনদ্বয় হইতেও ফেন-

নিঃসারণের অকর্ত্তব্যতা অনুমিত হইতে পারে *। প্রাচীন কালে হিন্দুগণের আহারাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে, ফেনযুক্ত হবিষ্যই তাঁহাদের প্রধান আহার ছিল। তাঁহারা কিরূপ বলশালী ছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সিদ্ধ তণ্ডুল প্রচলনের ন্যায় ফেননিঃসারণ প্রথাও আধুনিক বলিয়া অনুমিত হয়। ফেনযুক্ত অন্ন প্রস্তুত করিতে পাক সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, কারণ, কিরূপ তণ্ডুল, কি পরিমাণ জলে, কিরূপ অগ্নিসন্তাপে পাক করিলে, সমস্ত জল শোষিত হইয়া সুসিদ্ধ অন্ন প্রস্তুত হয়, তাহা জানা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু ফেন-নিঃসারিত অন্নপ্রস্তুতকরণ অপেক্ষাকৃত সহজ; কারণ, যথেষ্ট জলদ্বারা যেরূপ তাপে হউক না, সিদ্ধ করিয়া ফেন নিঃসৃত করিলেই অন্ন প্রস্তুত হইল। এই জন্যই বোধ হয়, ক্রমশঃ ফেন-নিঃসারিত অন্নের প্রচলন হইয়াছে।

---

* ভাব প্রকাশে কেবল জ্বরাধিকারে অন্নের ফেননিঃসারণের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়, যথা :—

"জলে চতুর্দ্দশ গুণে তণ্ডুলানাং চতুষ্পলং।
বিপচেৎ স্রাবয়েন্মণ্ডং তদ্ভক্তং মধুরংলঘু॥"

অর্থাৎ, চারিপল তণ্ডুল চতুর্দ্দশ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার মণ্ড অর্থাৎ ফেন ফেলিয়া দিবে। এইরূপে সংস্কৃত অন্ন লঘুপাক ও মধুর।

এস্থলে, পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ে ফেন ফেলিয়া দিবার কোন উল্লেখ না থাকায়, কিন্তু শেষোক্ত এই শ্লোকটীতে তাহার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ থাকায়, কেবল জ্বরাদি রোগের সময় বিশেষ লঘুপাক করিবার জন্যই ফেন নিঃসারণ আবশ্যক; কিন্তু সাধারণ ব্যবহারের জন্য নহে, ইহাই সূচিত হইতেছে।

অন্নের ফেন নির্গত করা যে অন্যায়, তাহা আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি, এক্ষণে প্রবন্ধের দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য বিষয়টীর মীমাংসা করিতে হইবে। অর্থাৎ, ফেননিঃসারিত অন্নভোজনে এদেশ-বাসীগণের বলের হ্রাস হইতেছে কি না, ইহাই বিচার্য্য। শারীরিক বলবীর্য্য আহারীয় দ্রব্যের উপর যেরূপ নির্ভর করে, এরূপ আর কিছুতেই নহে; হিতকারী ও পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিলে শরীরে বলাধান হয়, এবং অপকারী ও অপুষ্টিকর দ্রব্য আহারে বলের হ্রাস হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অন্নের ফেন নির্গত করিলে উহার পুষ্টিকারিতার হ্রাস হয়, ও উক্ত অন্ন স্বাস্থ্যরক্ষণে সম্পূর্ণরূপে উপযোগী নহে, ইহা আমরা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি। অতএব এই ফেননিঃসারিত অন্নভোজনে এদেশবাসীগণের বলের হ্রাস ও স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছে, ইহাও স্বতঃসিদ্ধ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

আমরা যে কোন কার্য্য করি, তদ্দ্বারা প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের শরীরের অসংখ্য জীবাণু বিনষ্ট হয়। একবার পদবিক্ষেপ করিলাম, অমনই শরীরের কতকগুলি জীবাণু নষ্ট হইল; একটু চিন্তা করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের কতক গুলি জীবাণু ধ্বংস হইল; হাঁচিলাম, অমনই অঙ্গের সঞ্চালিত অংশের কতকগুলি জীবাণু ক্ষয় হইল; এইরূপে আমাদের প্রত্যেক কার্য্যদ্বারা প্রতি-নিয়ত আমাদের শরীরের অসংখ্য জীবাণু বিনষ্ট হইতেছে। এইক্ষয় নিবারণের জন্য যবক্ষারজানময় খাদ্যই প্রধান; কারণ, ইহাদ্বারা দৈহিক যন্ত্রের পুষ্টিসাধন ও জীর্ণসংস্কার হয়, অর্থাৎ, উল্লিখিতরূপে আমাদের শরীরের যে প্রতিনিয়ত ক্ষয় হইতেছে,

তাহা যবক্ষারজান পূরণ করে; তদ্ভিন্ন ইহা তেজ উৎপাদন করে, এবং ঐ তেজদ্বারা পেশী ও স্নায়ুমণ্ডলীর কার্য্য হইয়া থাকে। অতএব ফেননিঃসারিত যবক্ষারজানশূন্য অন্ন আহার করিলে, আমাদের শরীরের যে প্রতিনিয়ত ক্ষয় হইতেছে, তাহার সম্যক পূরণ হইতে পারেনা, এবং পেশী ও স্নায়ুমণ্ডলীর কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। ফেননিঃসারিত অন্নে যবক্ষারজান থাকিলেও, সে এত অল্প যে, তদ্দ্বারা আমাদের শরীরের যে পরিমাণ ক্ষয় হইতেছে, তাহার সম্পূর্ণ পূরণ হইতে পারে না। ক্ষয় অপেক্ষা পূরণ অল্প হইলেই বলের হ্রাস হইতে থাকে। এইজন্যই আমরা বলি, ফেননিঃসারিত অন্নভোজনে এদেশবাসীগণের বল দিন দিন হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। যাঁহারা সঙ্গতিপন্ন তাঁহারা যবক্ষারজানবিশিষ্ট অন্যান্য খাদ্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার করিয়া উক্ত অভাব কথঞ্চিৎ পূরণ করিতে পারেন, কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে উহা পূরণ হইবার কোনও উপায় নাই। অতএব ফেননিঃসারিত অন্নভোজন করিয়া এদেশবাসীগণ যে দিন দিন অলক্ষিতভাবে হীনবল হইতেছে, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। বাল্যকাল হইতে আমরা ফেননিঃসারিত অন্ন আহার করিয়া আসিতেছি বলিয়া ইহার কুফল প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহা দ্বারা আমাদের শরীরের যে কিরূপ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। দিন দিন যদি অণুপরিমিত বলেরও হ্রাস হয়, তাহা হইলে সমস্ত জীবনে কি পরিমাণে বলক্ষয় হয়, তাহা চিন্তা করিলে অনুতাপিত হইতে হয়। বলক্ষয়ের অবশ্যম্ভাবী ফল স্বাস্থ্যভঙ্গ, আয়ুক্ষয়

ও অকালমৃত্যু ; অতএব চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই ফেননিঃসারিত অন্নভোজনের কুফল মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

যাঁহারা কোন বিষয় প্রত্যক্ষ না করিলে স্বীকার করিতে চান না, তাঁহারা ফেননিঃসারিত অন্নভোজনের অনিষ্টকারিতা নিম্নলিখিতরূপে পরীক্ষা করিতে পারেন। যদি কোন সুস্থকায় ব্যক্তি ফেনযুক্ত অন্ন মাসত্রয় আহার করিয়া, অবশেষে মাসত্রয় ফেননিঃসারিত অন্ন আহার করেন, এবং যদি তিনি উভয়বিধ অন্নের পরিমাণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক আহারীয় দ্রব্যের অর্থাৎ দাল, তরকারী, মৎস্য, দুগ্ধ ইত্যাদির পরিমাণ ও ক্রম প্রথম ও শেষ মাসত্রয়ে একইরূপ নিয়মিত করিতে পারেন, তাহা হইলে, প্রথম মাসত্রয়ের শেষে তাঁহার শরীরের যে গুরুত্ব হইবে, ষষ্ঠ মাসের শেষে তাঁহার গুরুত্বের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইবে। সময়ে সময়ে উল্লিখিত নিয়মের অন্যথা দৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রথম মাসত্রয়ে যে যে দ্রব্য যথাক্রমে, যে পরিমাণে, যেরূপ প্রণালীতে পাক করিয়া ভক্ষিত হইয়াছে, শেষ মাসত্রয়ে ঠিক সেই সেই দ্রব্য, সেই ক্রমে, সমানপরিমাণে, এবং সেই প্রণালীতে পাক করিয়া ভক্ষিত হয় নাই। তদ্ভিন্ন ঋতুর পরিবর্ত্তন, পরিশ্রম ও আচরণের বিভিন্নতা ইত্যাদি কারণেও দেহের গুরুত্বের তারতম্য হইতে পারে। অতএব পরীক্ষা করিতে হইলে ঐ অবস্থা গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য, এবং প্রত্যহ অনেক দ্রব্য আহার করা অপেক্ষা দুই তিনটী দ্রব্য আহার করিলে পরীক্ষার ফল সুনিশ্চিত হইতে পারে।

যাহা হউক, কেবল ফেননিঃসারিত অন্নভোজনেই এদেশবাসীগণ হীনবল হইতেছে, এরূপ আমরা বলি না; এদেশবাসীর বলক্ষয়ের বহুবিধ কারণ এক্ষণে বর্ত্তমান, তন্মধ্যে ফেননিঃসারিত অন্ন ভোজন অন্যতম কারণ, ইহাই আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য।

অতঃপর, আমরা প্রবন্ধের তৃতীয় বিষয়টীর আলোচনা করিয়া উপসংহার করিব। ইহা দ্বিতীয় প্রতিপন্ন বিষয় হইতেই অনুমিত হইতে পারে। শরীরের সহিত মনের এরূপ সম্বন্ধ যে, কোন কারণে শরীর দুর্ব্বল হইলে, মন নিস্তেজ হইতে থাকে এবং শরীর সবল হইলে, মানসিক শক্তিরও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হয়। শরীরই মনুষ্যের সমস্ত উন্নতির মূল। শরীর সুস্থ ও সবল না হইলে কোন কার্য্যই সাধিত হয় না।

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমং।"

সুস্থকায় ব্যক্তিই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গফললাভের অধিকারী। বলবান্‌ব্যক্তি স্বভাবতঃ শ্রমশীল, কার্য্যদক্ষ উৎসাহী, সহিষ্ণু, অধ্যবসায়শীল, সাহসী ও প্রতিভাসম্পন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু দুর্ব্বল ব্যক্তিতে সচরাচর এ সমস্ত গুণ লক্ষিত হয় না। দুর্ব্বল ব্যক্তি স্বভাবতঃ রোগপ্রবণ, ব্যাধি দুর্ব্বল দেহে সহজে আক্রমণ করিয়া থাকে, দুর্ব্বল ব্যক্তি শ্রমশীল ও কার্য্যদক্ষ হইতে পারে না, কার্য্যে তাহার উৎসাহ জন্মে না, সে কষ্ট সহ্য করিতে অক্ষম, কোন কার্য্যে একবার অকৃতকার্য্য হইলে, সে নিরুৎসাহ ও ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়ে, পুনরায় চেষ্টা করিবার প্রবৃত্তি হয় না। বলহীন ব্যক্তি কদাচিৎ সাহসী ও

প্রতিভাশালী হইয়া থাকে। বিদ্যার্জ্জনই হউক, অর্থোপার্জ্জনই হউক, অথবা অন্য কোন মহৎ কার্য্যই হউক, কিছুই উল্লিখিত শ্রমশীলতা ইত্যাদি গুণ ব্যতিরেকে সুসিদ্ধ হয় না। বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্প এই তিনটীই দেশের ধনাগমের প্রকৃষ্ট উপায়, তদ্ভিন্ন রাজসেবা ও বৃত্তিবিশেষ দ্বারাও ব্যক্তিবিশেষের ধনলাভ হইতে পারে। কিন্তু কি বাণিজ্য, কি কৃষি, কি শিল্প, কি রাজসেবা, কি অন্য কোন বৃত্তি, সকলেরই সম্যক উন্নতি উল্লিখিত গুণসাপেক্ষ। যে জাতি দিন দিন হীনবল হইতে থাকে, তাহার শ্রমশীলতা, কার্য্যদক্ষতা, উৎসাহ, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, সাহস ও প্রতিভা ইত্যাদি গুণেরও হ্রাস হইতে থাকে। সুতরাং সে জাতি বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প কিম্বা স্ব স্ব বৃত্তির সম্যক উন্নতিসাধন করিয়া ধনবৃদ্ধি করা দূরে যাউক, বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদির অবনতির সহিত উক্ত জাতি দিন দিন নির্দ্ধন হইতে থাকে। কোন হীনবীর্য্য জাতিরই ধনশালী হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় না। পৃথিবীর বলবান্ জাতি গুলিই ধনবান্ বলিয়া খ্যাত। ইংরেজগণ যেরূপ বলবান্ ও দৃঢ়কায়, তেমনই শ্রমশীল, কার্য্যদক্ষ অধ্যবসায়শীল, সাহসী ও প্রতিভাসম্পন্ন, এবং এইজন্যই তাঁহারা এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ধনবান্ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুগণ যেরূপ অপরিসীম বলশালী তদ্রূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন, ঐ সময়ে ভারতবর্ষের তুল্য সমৃদ্ধিশালী দেশ পৃথিবীর আর কুত্রাপি ছিল না। এক্ষণে তাঁহাদেরই অধস্তন পুরুষ দিন দিন ক্ষীণকায়, দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইয়া পড়িতেছে, এবং দারুণ দারিদ্র্য তাহাদিগকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে। যথেষ্ট

পুষ্টিকর আহারের অভাবে বঙ্গবাসী দিন দিন হীনবল হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে শ্রমশীলতা, অধ্যবসায়, উৎসাহ, সাহস ইত্যাদিও হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে এবং মানসিক শক্তি ক্রমশঃই নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে ; দেহের অবনতির সহিত সকল বিষয়েরই অবনতি হইতেছে, এরূপ অবস্থায় যে দেশ নির্দ্ধন হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

বঙ্গবাসীগণ ফেননিঃসারিতঅন্নভোজনে হীনবল হওয়ায় কিরূপে নির্দ্ধন হইতেছেন, তাহা আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি। এক্ষণে, অন্নের ফেননিঃসারণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাদের নির্দ্ধনতার কারণ কি না, দেখা যাউক। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সিভিল সার্জন্ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস বসু মহাশয় পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এক সের তণ্ডুল পাক করিলে কেবল চৌদ্দ ছটাক তণ্ডুলের অন্ন উৎপন্ন হয়, এবং যে পরিমাণ তণ্ডুল সিদ্ধ করা যায়, তাহার আট অংশের এক অংশ পরিত্যক্ত হয়। * অতএব আধুনিক পাকপ্রণালী অনুসারে প্রতিসের তণ্ডুলে অর্দ্ধ পোয়া তণ্ডুল পরিত্যক্ত হয়। বঙ্গের একটী ক্ষুদ্র পরিবারে যদি ৪ চার জন লোক থাকে এবং লোক প্রতি গড়ে প্রত্যহ দুই বেলায় অর্দ্ধ সের তণ্ডুলের আবশ্যকতা হয়, তাহা হইলে, উক্ত পরিবারে প্রতিদিন দুই সের তণ্ডুল ব্যয়িত হইবে। কিন্তু প্রতিসের তণ্ডুলে অর্দ্ধ পোয়া তণ্ডুল পরিত্যক্ত হয়। অতএব দুই সের তণ্ডুলে প্রত্যহ এক পোয়া তণ্ডুল পরিত্যক্ত হওয়ায়, মাসে ৭॥ সাড়ে সাত সের তণ্ডুল পরিত্যক্ত হয়, এবং বৎসরে দুই মন দশ সের, এবং

* প্রবন্ধের ৯।১০ পৃষ্ঠা।

পরিবারপ্রতিপালকের জীবনে (পঞ্চাশ বৎসরে) ১১২॥ এক শত সাড়ে বার মন তণ্ডুল অপব্যয়িত হইয়া থাকে। এইরূপ অপব্যয় বঙ্গবাসীর নির্দ্ধনতার অন্যতম কারণ বলিতে পারা যায় কি না, পাঠক মহোদয় বিচার করিবেন।

এতদ্ভিন্ন, এই ফেননিঃসারিত অন্নভোজনে বঙ্গবাসী আর এক প্রকারে নির্দ্ধন হইতেছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সাধারণ লোকেই ফেননিঃসারিত অন্নের অধিকতর কুফল ভোগ করিতেছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই শ্রমজীবী। দেশের শ্রমজীবী লোকেরা যদি হীনবল হইতে থাকে, তাহা হইলে কৃষি ও শিল্পের দিন দিন অবনতি হয়। যে পরিমাণ শস্য এক্ষণে উৎপন্ন হইতেছে, তাহাদের শরীর সবল হইলে, আরও অধিক পরিমাণে শস্য জন্মিতে পারে, এবং যে সমস্ত শিল্পদ্রব্য এক্ষণে উৎপন্ন হয়, তাহাও অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে। শ্রমজীবী লোকই দেশের উন্নতির মুল স্বরূপ, তাহাদের কার্য্য ব্যতীত ধনবান্ ব্যক্তি জীবনধারণে সমর্থ হন না। অতএব যদি এইমাত্র স্বীকার করা যায় যে, দেশের কেবল শ্রমজীবীগণ ফেননিঃসারিত অন্নভোজনে হীনবল হইতেছে তাহা হইলেও, তজ্জন্য যে দেশ নির্দ্ধন হইতেছে, ইহা সপ্রমাণ হইল।

অতএব যে দিক হইতেই বিচার করা যায়, সেই দিক হইতেই প্রতিপন্ন হয় যে, ফেননিঃসারিত অন্নভোজন করিয়া এদেশবাসীগণ নির্দ্ধন হইয়া পড়িতেছে। কেবল এই কারণেই যে বঙ্গবাসীগণ নির্দ্ধন হইতেছে এমত নহে, তাহাদের নির্দ্ধনতার বহুবিধ কারণ

এক্ষণে বিদ্যমান (এস্থলে তৎসমুদায়ের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক) তন্মধ্যে ফেননিঃসারিত অন্নভোজন যে অন্যতম কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অন্নের ফেননিঃসারণ কি জন্য অনিষ্টকারী এবং ফেননিঃসারিত অন্নভোজন করিয়া এদেশবাসীগণ কিরূপে হীনবল ও নির্দ্ধন হইতেছে, তাহা পাঠকবর্গ দেখিয়াছেন। এক্ষণে ফেনযুক্ত অন্নাহার যাহাতে বঙ্গের গৃহে গৃহে প্রবর্ত্তিত হয়, তদ্বিষয়ে সকলেরই যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। ধনবান্ ব্যক্তি মনে করিতে পারেন, আমিত অন্নের সহিত অন্যান্য যথেষ্ট পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিয়া থাকি, তবে আর ফেনপরিত্যাগ করাতে ক্ষতি কি? কিন্তু এরূপ মনে করা ভ্রান্তি মাত্র। আমাদের দেশে ক্রোড়-পতি হইতে সামান্য ভিক্ষুক পর্য্যন্ত সকলেই অল্পাধিক পরি-মাণে অন্নাহার করিয়া থাকেন। অন্নই এদেশবাসীর প্রধান হিতকর আহার; দাল, তরকারী, মৎস্য, দুগ্ধ ইত্যাদি আনু-ষঙ্গিক উপকরণ মাত্র। ধনবান্ ব্যক্তির আহারে এই উপকরণ সামগ্রী গুলি অধিক পরিমাণে থাকায়, অন্নের পরিমাণ অপেক্ষা-কৃত অল্প থাকে সত্য, কিন্তু তথাপি ইহা তাঁহার আহার্য্য দ্রব্য সমষ্টির চতুর্থাংশের ন্যূন কিছুতেই হইবে না। এই চতুর্থাংশ খাদ্যের তেজস্কর অংশ পরিত্যাগ করিয়া আহার করা কি যুক্তি-সঙ্গত? কখনই নহে। অতএব কি ধনী, কি নির্দ্ধন, সকলের পক্ষেই ফেনযুক্ত অন্নাহার করাই প্রশস্ত ও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; বরং যাঁহারা সঙ্গতিপন্ন তাঁহাদের ফেনযুক্ত সিদ্ধ তণ্ডুলান্ন অপেক্ষা ফেনযুক্ত আতপতণ্ডুলান্ন আহার করা বিধেয়। হে বঙ্গমহিলাগণ!

তোমরা স্বহস্তে অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাক করিয়া পরিবারবর্গকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইতে পারিলে পরম আনন্দ লাভ করিয়া থাক, অতএব তোমাদের নিকট অনুরোধ, ফেন অকিঞ্চিৎকর বোধে আর পরিত্যাগ করিও না ; ফেনযুক্ত অন্ন পাকের যেরূপ প্রণালী কথিত হইয়াছে, একবার ঐ প্রণালীতে অন্ন পাক করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ, কিরূপ সুস্বাদু ও উপাদেয় অন্ন প্রস্তুত হয়। যে ফেনের সহিত তণ্ডুলের শ্রেষ্ঠ উপাদান ও স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান সহায় যবক্ষারজান নির্গত হইয়া যায়, একমাত্র যাহার উপর নির্ভর করিয়াও সুস্থশরীরে কিছুকাল জীবন ধারণ করিতে পারা যায়, তাহা কি কখন পরিবর্জ্জনীয় হইতে পারে ? আমাদের আহারের উপকরণ সমূহের মধ্যে দুগ্ধ, ঘৃত ও মৎস্যই প্রধান, কিন্তু এই গুলি আজকাল এরূপ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য যে, সাধারণ লোকে পূর্ব্বের ন্যায় আর এগুলি আহার করিতে পায় না, অধিকন্তু বিশুদ্ধ দুগ্ধ ঘৃতও আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই জন্যই প্রবন্ধের প্রারম্ভে আমরা বলিয়াছি যে, অন্নের ফেননিঃসারণ দ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে অধিকতর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে এক মাত্র অন্নই দেশের সাধারণ লোকের জীবনোপায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই অন্নের পুষ্টিকর ও তেজস্কর অংশ ত্যাগ করিয়া, যদি আমরা সিকৃথ আহার করি, তাহা হইলে আর আমাদের বলবীর্য্য কোথা হইতে আসিবে ? হে স্বদেশবাসীগণ! বলই জাতীয় উন্নতির মূলীভূত কারণ, এবং হিতকর ও পুষ্টিকর আহারই বলবিধানের উপায় ; অতএব পুষ্টিকর দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া অপুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিওনা, আহারের সারাংশ

বর্জ্জন করিয়া অপেক্ষাকৃত অপুষ্টিকর অংশ গ্রহণ করিও না, তাহা হইলে বলবীর্য্য বৃদ্ধি হইবে, বলবীর্য্য বৃদ্ধি হইলে সকল বিষয়েই উন্নতি হইবে, দেশে ধনাগম হইতে থাকিবে, এবং যে ক্লেশকর দারিদ্র্যের তাড়নায় আজ কত শত লোক হাহাকার করিতেছে, তাহাও দূরীভূত হইবে।

সমাপ্ত।